বিজ্ঞান কথন

Indian Science News Association ESTD.-1935

কলকাতা/ জুন ৯, ২০২৫ সোমবার, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

কি ব্যবহার করবেন?

প্লাস্টিক দূষণের অবসান হোক। এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল ভাবনায় রয়েছে এই বিষয়টি। এই ভাবনা মাঝে মাঝেই জনগণকে ভাবানো হয় বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু তাও মানুষের মধ্যে কতটা সচেতনতা বোধ গড়ে উঠেছে তা বলা মুশকিল।

ভারতে বর্তমানে ১২০ মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বহু মানুষ নিত্য দিনের ব্যবহারে এই প্লাস্টিক ব্যবহার করেন। বিশেষ করে বাজার থেকে বিভিন্ন জিনিস আনার জন্য। তারপর প্লাস্টিক একবার ব্যবহার করেই যত্রতত্র ফেলে দেন। এই ধরনের প্লাস্টিক মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি-ভিত্তিক রাসায়নিক (পেট্রোকেমিক্যাল) দিয়ে তৈরি এবং ব্যবহারের পরেই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে - ফেলে দেওয়ার জন্য তৈরি।

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সাধারণত প্যাকেজিং এবং পরিষেবা সামগ্রী, যেমন ব্যাগ, বোতল, মোড়ক ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। এই প্লাস্টিক আসলে ভেঙে যায় না। মাটিতে মিশে যায় না। ক্ষয়-ক্ষতি, ধোঁয়া, রোদ ও তাপ, ধীরে ধীরে প্লাস্টিককে ছোট থেকে আরও ছোট টুকরোতে পরিণত করে, যা অবশেষে মাইক্রোপ্লাস্টিক নামে পরিচিত হয়। পাঁচ মিলিমিটারের ছোট এই ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের টুকরোগুলো সনাক্ত করা কঠিন এবং প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। আবার এমন প্লাস্টিকের কণাও আছে যা একটি মাইক্রোমিটারেরও কম পরিমাপের, যা ন্যানোপ্লাস্টিক নামে পরিচিত।

এই মাইক্রোপ্লাস্টিক গুলি খুব সহজেই জলে, কৃষিজমিতে ছড়িয়ে যায় এবং আমাদের দেহের অভ্যন্তরে গিয়ে মিশে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্লাস্টিক নাকি পাইরেনিস পর্বতমালা এবং মারিয়ানা ট্রেঞ্চের তলদেশের মত নির্জন স্থানেও পৌঁছেছে।

বন্যপ্রাণীদের জন্য এই মাইক্রোপ্লাস্টিক বিশেষভাবে বিপজ্জনক হতে পারে। খাওয়ার সময় এগুলি সহজেই প্রাণীদেহের ভিতরে জমা হয় এবং গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। কেউ কেউ এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছেন যে অতি ব্যবহারের ফলে মনুষ্য দেহের অভ্যন্তরেও এই মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া বিচিত্র নয়।

এখন প্রশ্ন হল প্লাস্টিকের বিকল্প কি হতে পারে! আসলে প্লাস্টিকই বিভিন্ন জিনিসের পরিবর্তে এসেছিল। যেমন, কাগজের ঠোঙার বদলে প্লাস্টিকের ব্যাগ, মাটির গ্লাসের বদলে প্লাস্টিকের গ্লাস, কাঁচের বোতলের বদলে প্লাস্টিকের বোতল ইত্যাদি। এই সমস্ত 'বহুবার ব্যবহৃত' প্লাস্টিকের জিনিসগুলো আমাদের সমাজে থাকবেই। কারণ, এরা সেভাবে ক্ষতি করছে না। ক্ষতি যেগুলো করছে, সেগুলি হল ১২০ মাইক্রনের নিচে প্লাস্টিকের তৈরি থালা, বাটি, গ্লাস, ক্যারি ব্যাগ ইত্যাদি। এগুলোর ব্যবহার আশু বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

প্লাস্টিকের পরিবর্তে কুসুরিপানা থেকে তৈরি থালা, বাটি, গ্লাস বাজারে পাওয়া যায় বিকল্প হিসাবে। আবার উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটের বিভিন্ন জায়গায় সম্প্রতি এক ধরনের পরিবেশ বান্ধব ক্যারি ব্যাগ বাজারে চালু হয়েছে যা ভুট্টার দানা থেকে তৈরি। এইগুলি মাটিতে সহজে মিশে যায়, পরিবেশের ক্ষতি করে না। অন্যদিকে সুদৃশ্য চটের ব্যাগও বিকল্প হিসেবে উঠে আসতে পারে।

ক্ষতিকর প্লাস্টিকের এই সমস্ত নতুন নতুন পরিবেশ বান্ধব বিকল্পগুলি খুব বেশি করে মানুষের কাছে আসা প্রয়োজন। তবেই মানুষ প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাবে। আর আমরা প্লাস্টিক দূষণ মুক্ত পরিবেশ পাব।

boseprasanta@hotmail.com
arnab_jour@yahoo.co.in

জৈব প্লাস্টিক: কি ও কেন?

স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী

আজকের পৃথিবী যেন প্লাস্টিকের আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। শহরের নর্দমা হোক বা গ্রামের পুকুর প্রতিটি কোণে চোখে পড়ে নানা ধরনের প্লাস্টিক বর্জ্য। সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক, যা শামুক-ঝিনুক থেকে শুরু করে মাছের পেটে জমা হচ্ছে, আর সেখান থেকে ফিরে আসছে মানুষের খাবারের পাতে। এমন দূষণের ভারে প্রতিনিয়ত ধুঁকছে প্রকৃতি।

এই সংকটময় সময়ে এক নতুন আশার নাম৩ জৈব প্লাস্টিক। এটি এমন এক ধরনের পরিবেশবান্ধব প্লাস্টিক, যা প্রকৃতি থেকে তৈরি এবং মাটিতে সহজেই মিশে যায়।

জৈব প্লাস্টিক তৈরি হয় প্রাকৃতিক উপাদান থেকে, যেমন ভুট্টার খোসা, আলুর স্টার্চ, আখের রস বা গমের খুদ। এগুলি থেকে তৈরি প্লাস্টিক যেমন পরিবেশের সাথে সহজে মিশে যায়, তেমনই প্রাকৃতিকভাবে বিনষ্ট হয়ে মাটির উপযোগী হয়ে ওঠে। সাধারণ প্লাস্টিক যেখানে শত শত বছর ধরে রয়ে যায়, -সেখানে জৈব প্লাস্টিক কিছু মাস বা বছরের মধ্যেই পচে যায় এবং পরিবেশের

>>২

আর্গোনমিক্স কাজে 'আদর্শ পরিবেশ' তৈরির হাতিয়ার

দেবদুত ঘোষঠাকুর

এই প্রতিবেদনের শিরোনামটি লক্ষ্য করুন। ছটি শব্দের প্রথম পাঁচটি সবার কাছে অতি পরিচিত। ব্যতিক্রম আর্গোনমিক্স শব্দটি। পদার্থ বিজ্ঞানে আর্গ কথাটি কাজের একক। নমিক্স কথাটি এসেছে নোমোস থেকে, যার মানে বিদ্যা বা বিজ্ঞান। আর্গোনমিক্স কথাটির মানে দাঁড়ায় কাজের বিজ্ঞান। অন্য কথায় কর্ম প্রযুক্তি বিজ্ঞান।

অনেক দেশে এই বিষয়টিকে মানব প্রযুক্তি বিজ্ঞান (হিউম্যান ফ্যাক্টর্স ইঞ্জিনিয়ারিং) বলেও ডাকা হয়। এই বিজ্ঞান মূলত কর্মক্ষেত্রে কর্মী, যন্ত্র এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে কথা বলে।

কর্মক্ষেত্রের পরিবেশকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি - (ক) কর্ম সংস্কৃতি এবং (খ) কর্মক্ষেত্রের পরিচ্ছন্নতা, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু চলচলের অবস্থা, ধূলিকণার উপস্থিতি ইত্যাদি। এই দুই ধরনের পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেই আর্গোনমিক্সের ভূমিকা রয়েছে।

তবে এই প্রতিবেদনে মূলত দ্বিতীয় ভাগটিই কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে।

আমাদের মতো দেশে কাজের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা বেশি। তাই মানুষের জন্য যন্ত্রের বদলে, যন্ত্রের জন্য মানুষ - এই নিয়মটি এখানে মানা হয়। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কি হবে তা নির্ভর করে যন্ত্রের বা কাজের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। কিন্তু যে মানুষটি যন্ত্রকে পরিচালনা করছেন তাঁর সুবিধা-অসুবিধার দিকে কেউ নজর দেয়না। ফলে শ্রমিকের বা কর্মীর কর্মক্ষমতা দিনকে দিন হ্রাস পায়। এক সময় তাঁরা অক্ষম হয়ে পড়েন। আর আমাদের দেশে এত লোক বেকার যে, একজন

>>৪

জলে ফলে

প্রশান্ত কুমার বসু

বাঁশবেড়িয়া আর ব্যাঙ্গালোরের মধ্যে কি মিল বলুন তো? বলতে পারলেন না তো? সত্যি কথা বলতে কি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমিও পারতাম না যদি না ওঁর সঙ্গে আমার সম্প্রতি পরিচয় হত।

ওঁর অর্থাৎ প্রেমজিৎ তরফদারকে কি বলে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করাই? আমাদের পশ্চিম বঙ্গেরই ছেলে কিন্তু দীর্ঘ কাল ধরে সুদূর নিউ জিল্যান্ড প্রবাসী। শিক্ষাগত যোগ্যতায় হয়তো একজন ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু এখন ওঁকে একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী বললে বোধহয় ঠিক বলা হয়।

ঐ নিউ জিল্যান্ডের ক্রাইষ্টচার্চ শহরে গড়ে তুলেছেন এমন এক প্রতিষ্ঠান যাকে উনি গবেষণাগার বলতে ভালবাসেন। নাম দিয়েছেন ইলেকসিস ল্যাব। সেই ইলেকসিস ল্যাবেরই দুটি শাখা এখন গড়ে উঠেছে ঐ বাঁশবেড়িয়ায় এবং ব্যাঙ্গালোরে যেখানে এখন পুরো দমে গবেষণা এবং হাতে কলমে কাজ চলছে। মূল তত্ত্ব "হাইড্রোপ-নিকস!"

প্রেমজিৎ একটু কথা বলতেও ভালবাসেন। নিউ জিল্যান্ড থেকে প্রথম যেদিন আমাকে ফোন করলেন সেদিনই সময় সীমা দেড় ঘন্টা পেরিয়ে গিয়েছিল। কারণ, আমার মত বিশেষ অজ্ঞকে উনি "হাইড্রোপ-নিকস"-এর তত্ত্ব বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। সফল কতদূর হয়েছিলেন তা

>>২

INDIAN SCIENCE NEWS ASSOCIATION (ISNA)

cordially invites you to attend the celebration of

WORLD ENVIRONMENT DAY 2025

to be held on
Monday, 9th June, 2025 at 5.00 p.m.

in the N.R. Sen Auditorium, University of Calcutta
Rashbehari Siksha Prangan, 92, A.P.C. Road, Kolkata – 700 009

Speakers:
Dr. Swati Nandi Chakraborty
Environment Consultant of Cantonment Board (Govt. of India),
Chief Editor, International Journal of Bioinformatics & Biological Sciences

Shri Premjit Tarafdar
Co-founder & CTO of ElecSys Lab, Christchurch, New Zealand

Chairman:
Dr. Debdut Ghoshthakur
former Chief Reporter and environment writer, Anandabazar Patrika

Prof. Bikas K. Chakrabarti
President, ISNA
former Director, Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata
will preside over the programme.

Prof. Manas Chakrabarty
Honorary Secretary, ISNA

Dr. Amit Krishna De
Honorary Secretary, ISNA

Dated: 3rd June, 2025
Indian Science News Association
92, A.P.C. Road, Kolkata – 700 009
Phone: 033-2350-2224

ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বোস

মানস চক্রবর্তী

ভারতের প্রথম ইন্টিগ্রেটেড ইস্পাতকারখানা জামশেদপুরের টাটা আয়রন ও স্টিল কোম্পানি বা টিসকোর কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এই কারখানা স্থাপনের কৃতিত্বের প্রকৃত অধিকারী যে একজন পথিকৃৎ ভূতত্ত্ববিদ, সেই প্রমথনাথ বোস বা পিএন বোসের সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না। এই বিজ্ঞানী

সম্বন্ধে আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস মন্তব্য করেছিলেন যে প্রমথনাথের জীবনকালে বাংলাদেশ তাঁকে আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সমাসনে বসিয়ে ছিল। কিন্তু এ হেন ব্যক্তিও জনমানসে বিস্মৃতপ্রায়। পিএন বোসের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে তাঁর এক সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা এখানে পেশ করছি।

পিএন বোস অধুনা নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত গৈপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৫ সালের ১২ই মে। প্রবেশিকা (১৮৭১) ও-----

>>২

ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বোস

পাতা ১ এর পর>>

ও এফএ (১৮৭৩) পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর গিলক্রিস্ট বৃত্তি নিয়ে ১৮৭৪ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিজ্ঞানে স্নাতক হন ১৮৭৮ সালে। উল্লেখ্য, কোন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে তিনিই প্রথম ভারতীয় স্নাতক। এরপরে লন্ডনের স্কুল অব মাইনসে তিনি জীবাশ্ম বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন।

পিএন বোস ১৮৮০ সালে বোস ভারতে ফিরে আসেন এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা জিএসআইতে প্রথম ভারতীয় হিসেবে এক গ্রেডেড অফিসার হিসেবে যোগদান করেন।

জিএসআইতে ২৩ বছর চাকরি করার সময় পিএন বোস ব্রিটিশ ভারত ও বার্মার বিস্তৃত অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক জরিপ করেছেন। একই সাথে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূতত্ত্ববিদ্যা পড়াতেন (১৯০১-১৯০৩)। ইতিমধ্যে ১৮৮২ সালে তিনি ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন।

তিনি জিএসআই থেকে পদত্যাগ করেন ১৯০৩ সালে। সাথে সাথেই অবশ্য ওড়িশার ময়ুরভঞ্জে 'রাজ্য ভূতত্ত্ববিদ' হিসেবে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি ময়ুরভঞ্জের গরুমহিসানি পাহাড়ের পাদদেশ ও ঢালে লোহার আকরিক হেমাটাইটের একটি সমৃদ্ধ খনি আবিষ্কার করেন। এর ঠিক পরেই তিনি জানতে পারেন যে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জামশেদজী টাটা একটি আধুনিক ইস্পাত কারখানা তৈরি করার পরিকল্পনা করছেন। পিএন বোস টাটাকে একটি চিঠি লেখেন ১৯০৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি। ঐ ঐতিহাসিক চিঠিতে তিনি টাটাকে অনুরোধ করেন প্রস্তাবিত কারখানাটি গরুমহিসানি খনির কাছে স্থাপন করতে। ঐ বছর মে মাসে টাটার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দোরাবজী টাটা পিএন বোসের অনুরোধ মত জামশেদপুরের সাকচিতে ১৯০৭ সালে টিসকোর স্থাপনা করেন যা অধুনা ঝাড়খন্ডে অবস্থিত।লক্ষনীয়, টিসকো কর্তৃপক্ষ জামশেদপুরে পিএন বোসের প্রতিটি জন্মবার্ষিকী পালন করেন।

ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, ও সৃজনশীল লেখালেখিতে পিএন বোসের যথেষ্ট অবদান আছে। তাঁর দুটি বিশেষ অবদানের একটি হল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের শতবর্ষ সংকলনের (১৮৮৪) বিজ্ঞান বিষয়ক তৃতীয় ভাগটির সম্পাদনা। দ্বিতীয়টি হল তাঁর মহাকাব্যিক রচনা 'এ হিস্ট্রি অব হিন্দু সিভিলাইজেশন ডিউরিং ব্রিটিশ রুল(১৮৯৪)'। উপরন্তু, বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের তিনিই প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন।

তিনি রাঁচিতে অবসর জীবন যাপন করছিলেন ১৯০৮ সাল থেকেই। পিএন বোস রাঁচিতেই প্রয়াত হন। দিনটা ছিল ১৯৩৪ সালের ২৭শে এপ্রিল।

অবৈতনিক সম্পাদক, ইসনা

সায়েন্টুন

Rajat Sardar, former student, ISNA

জৈব প্লাস্টিকঃ কি ও কেন?

পাতা ১ এর পর>>

কোনো ক্ষতি করে না।

এই প্লাস্টিক দেখতে অনেকটা সাধারণ প্লাস্টিকের মতোই, তবে এর গুণগত মান ও প্রভাব একেবারে আলাদা। অনেক সময় দোকানে আমরা দেখি "কমপোস্টেবল" বা "বায়োডিগ্রেডেবল" লেখা প্যাকেট, সেগুলিই জৈব প্লাস্টিকের উদাহরণ।

আমাদের এ বিষয়ে নিজের সচেতন হতে হবে এবং অন্যকেও সচেতন করতে হবে। এই ধরনের প্লাস্টিককে পচিয়ে ফেলা যায় কম্পোস্ট পিটে, যেখানে এটি অন্যান্য জৈব বর্জ্যের সঙ্গে মিশে যায়।

একটি বড় প্রশ্ন এটা কি আদৌ সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। তবে এর জন্য চাই সরকারি সহায়তা, শিল্পক্ষেত্রের উৎসাহ, আর নাগরিক সচেতনতা। যদিও এখনো জৈব প্লাস্টিক তৈরির খরচ কিছুটা বেশি, তবু গবেষণা চলছে, প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে, উৎপাদনব্যবস্থা সহজ হচ্ছে। যদি আমরা এখন থেকেই উদ্যোগ নিই, তাহলে ভবিষ্যতের পৃথিবীকে বাঁচানো কঠিন কিছু নয়।

আমরা যদি আজ একবার ভাবি একটা প্লাস্টিক ব্যাগ ফেলে দেওয়ার বদলে একটা জৈব ব্যাগ ব্যবহার করি, তাহলে হয়তো আমাদের ছোট্ট পদক্ষেপ থেকেই শুরু হবে এক বড় পরিবর্তনের যাত্রা। তাইতো জৈব প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়াতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। বাজারে গেলে সাধ্যের মধ্যে এমন প্যাকেজিং বা ব্যাগ বেছে নিতে হবে যা প্রকৃতির ক্ষতি না করে বরং প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দেয় তার নিজস্ব ভারসাম্য।

সরকার, বেসরকারি সংস্থা, ও সাধারণ মানুষ একসাথে উদ্যোগ নিলে জৈব প্লাস্টিক হতে পারে পরিবেশ রক্ষার এক শক্তিশালী হাতিয়ার। আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই পরিবর্তনটি গ্রহণ করি, তাহলে ভবিষ্যতের পৃথিবী আরও সবুজ, সুন্দর ও বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

প্রখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী

জলে ফলে

পাতা ১ এর পর>>

তবে এটুকু বুঝতে পারলাম গোদা বাংলায় এই তত্ত্বর প্রধান অর্থ মাটি বাদ দিয়ে জলে গাছ জন্মানো। এ জল অবশ্য সাদামাটা জল নয়। এ জলীয় দ্রবণটিতে থাকতে হবে অণুখাদ্য বা নিউট্রিয়েন্টস যা ঐ গাছের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।

"এ তত্ত্বের যদি সঠিক প্রয়োগ হয় পশ্চিম বঙ্গের মত রাজ্যে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যাবে," বেশ জোরের সঙ্গে বললেন প্রেমজিৎ। এমনিতেই আমাদের এ রাজ্যে চরম গ্রীষ্মে জলাভাবে বহু জেলায় দুর্ভিক্ষের মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় কোন কোন বছরে। আবার আবহ-াওয়াতে আদ্রতারও প্রভাব রয়েছে। উনি আশাবাদী যে এ পরিস্থিতিতে অবশ্যই কাজ করা সম্ভব যদি ঠিকঠাক সব কিছু করা যায়।

কাজের কথা যদি উঠল তাহলে বলা যেতে পারে স্বভাবের দিক থেকেও প্রেমজিৎ একটু জেদি। যে কাজটা করবেন সেটা সম্পূর্ণ করার জন্য উনি অসম্ভব চেষ্টা করবেন। এবং করেও চলেছেন। কিছুদিন আগে কলকাতায় ফিরেছেন। এখন ওঁর মূল লক্ষ্য বাঁশবেড়িয়ায় অনেকটা জায়গা জুড়ে ওঁর পৈত্রিক বাড়িটিকে একটি "ইকো-ফ্রেন্ডলি" গবেষণাগার বানানো, যেখানে এই বিজ্ঞান-সঞ্চালিত কর্মধারায় "হাইড্রোপ-নিকস," সৌর বিদ্যুৎ এবং পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতির সমন্বয় ঘটানো হবে এবং বাড়িটিকে ঠান্ডা রেখে "কন্ট্রোলড এনভায়রনমেন্ট এগ্রিকালচার"-এর কাজ চালানো হবে।

থাকবেন হয়তো কয়েক সপ্তাহ। কিন্তু তার মধ্যেই প্রেমজিৎ এই কাজটি সমাপ্ত করে যেতে চাইছেন। এটিকে একটি "পাইলট প্রোজেক্ট" বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এর জন্য উনি রাতদিন পরিশ্রম করছেন, দেখা করছেন বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে, বক্তব্য রাখছেন শিক্ষাবিদদের সভায়, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে সবাই ব্যাপারটা ভালো করে বোঝেন।

ওঁর কথানুযায়ী, প্রতি সাড়ে ছয় বর্গমিটারে ৬০০ থেকে ৭২০টি চারা বেড়ে উঠবে। জলের সাশ্রয় হবে প্রায় ৯০ শতাংশ। এই মডেলটিই ভারতবর্ষ এবং নিউ জিল্যান্ডের বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীদের যৌথ সমন্বয়ে গড়ে উঠছে। বাঁশবেড়িয়া প্রকল্প এর ফলে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে জায়গা করে নিচ্ছে।

আমি আরও সহজ করে বুঝতে চাইলে প্রেমজিৎ উদাহরণস্বরূপ ধনেপাতার কথা বললেন। বাঙালির খাবারের পাতে এখন প্রায় বারোমাসই ধনেপাতা ঠাঁই করে নিয়েছে। শীতে সহজলভ্য কিন্তু গরমকালে অনেক দাম দিয়ে কিনতে হয়। এমনিতে ধনেপাতার গাছ বেড়ে উঠতে সময় লাগে প্রায় দেড় মাস। নতুন এই পদ্ধতিতে তিন সপ্তাহের মধ্যই লকলকে ধনেপাতার চারা পাওয়া যাবে। মাটিতে পোঁতা নয়। কাজেই মৃত্তিকাসম্ভূত কোন রোগের সম্ভাবনা নেই। জলও যা খরচ হচ্ছে তাও পূর্ণব্যবহারযোগ্য।

কারিগরি কৌশলে শুধু প্রয়োজন হচ্ছে ছ'টি ধাপের লম্বা একটি "হাইড্রোপনিক" থাকের মত ব্যবস্থা। সৌর বিদ্যুতের সাহায্যেই এই থাকের ভিতরটা ঠান্ডা করা যাবে।

"আমি তো শুধু ধনেপাতার উদাহরণ দিলাম। এই পদ্ধতিতে লেটুস, পালং শাক এবং আরও অনেক ধরণের শাক সবজি অনেক কম সময়েই বেড়ে উঠতে পারবে। সব থেকে বড় কথা, খরচেও অনেকটা সাশ্রয় হবে। গরীব চাষির হাতে দুটো পয়সা আসবে," বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই এই তরুণ বিজ্ঞানী কথাগুলো বললেন।

আমার বেশ ভাল লাগছিল প্রেমজিৎের কথাগুলো শুনতে, ওঁর ওপর বিশ্বাস রাখতে। কিন্তু আমি একা শুনলে তো হবে না। আমাদের সবার প্রিয় প্রতিষ্ঠান, ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন (ইসনা)-র সবায়েরই এই কথাগুলো শোনা দরকার।

আপনারা সবাই জানেন নিশ্চয়ই আজ ৯ই জুন আমরা আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। অনেক বিশিষ্ট লোকজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যাঁদের মধ্যে শ্রী প্রেমজিৎ তরফদারও রয়েছেন। আমরা সবাই শুনব ওঁদের কথা। আপনারা সবাই আসছেন তো?

সম্পাদক, বিজ্ঞান কহন
boseprasanta@hotmail.com

বায়োচার: একটি উল্লেখযোগ্য জৈব সার

পরিতোষ ভট্টাচার্য

একটি প্রশ্ন করি। বায়োচারের নাম শুনেছেন?

কারণ, সাম্প্রতিক কালে বায়োচার (Biochar) পরিবেশ বান্ধব কৃষিতে একটি উল্লেখযোগ্য জৈব সার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং শিরোনামে উঠে এসেছে। আসলে বায়োচার হলো কাঠকয়লা।

জৈব বস্তুর তাপীয় ভাঙনের (Pzrolysis) পর যা হচ্ছে, তা হল ছাই সমন্বিত হালকা ওজনের কালো অবশিষ্টাংশ (কার্বন)।

প্রায় ২০০ - ২৫০°C তাপমাত্রায় বাতাসের অনুপস্থিতিতে কাঠ কয়লাকে ভাঙবার পর যা যা বেরোয়, তা হল বায়োচার এবং বিভিন্ন ধরনের গ্যাস, যেমন মিথেন, হাইড্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি। এছাড়া কিছু উদ্বায়ী বস্তুও

(তেল) নিষ্কাশিত হয়।

বায়োচার প্রধানত মাটিতে বায়ু চলাচল বাড়াতে, মাটিতে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমাতে, পুষ্টি উৎপাদনের ক্ষরণ কমাতে এবং মাটির অম্লতা কমাতে ব্যবহার করা হয়।

বায়োচার মাটিতে জলের পরিমাণ বাড়াতে পারে। বায়োচার প্রয়োগ মাটির উর্বরতা ও কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও করতে সক্ষম।

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রীয় জৈব কৃষি কেন্দ্র, ভারত সরকার

রামব্রহ্ম সান্যাল: ভারতীয় চিড়িয়াখানার পথিকৃৎ

রিংকু দেবনাথ

কলকাতার অন্যতম দর্শনীয় স্থান আলিপুর চিড়িয়াখানায় হরেক পশুপাখি দেখে খুশির বাধ মানে না, কারোরই, বিশেষত শিশুদের। কিন্তু জানেন কি এই চি-ড়িয়াখানার প্রাণপুরুষ কে ছিলেন? তিনি রামব্রহ্ম সান্যাল, প্রথম ভারতীয় সুপারিনটেনডেন্ট আর কলকাতার জুলজিক্যাল গার্ডেনটি ছিল ভারতে প্রথম। তিনি কলকাতার চিড়িয়াখানার সুনাম পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের দরবারে।

রামব্রহ্ম সান্যাল ১৮৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় তার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বৈদ্যনাথ সান্যাল, পৈতৃক নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলারই মহুলা গ্রাম। বহরমপুর কলেজ থেকে প্রবেশিকা পাস করে, তিনি পড়াশোনার জন্য কলকাতায় আসেন এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। দৃষ্টিশক্তির প্রচণ্ড সমস্যায় মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্বেও তাঁকে চিকিৎসাবিদ্যা পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। হতাশ রামব্রহ্মর দিকে তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাঁর শিক্ষক, মেডিক্যাল কলেজের বোটানির প্রফেসর ড. জর্জ কিং ও অ্যানাটমির প্রফেসর ও মিউজিয়ামের কিউরেটর ড. জন অ্যান্ডারসন। চিড়িয়াখানার কর্মজগতে রামব্রহ্ম সান্যালের আসার পিছনে ভূমিকা ছিল এঁদেরই।

জানা যায়, ১৮৬৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ই সি বেইলি সোসাই-টির বার্ষিক সভায় কলকাতায় একটি পশুশালা স্থাপনের কথা তোলেন। পরের বছর সোসাই-টির সভাপতি ড. জোসেফ ফেরার বিভিন্ন উপসমিতি গঠন করে চিড়িয়াখানা স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যান। এর পর ১৮৭৫-এর ২রা অক্টোবর বাংলার ছোট-লাট স্যর রিচার্ড টেম্পলের চেষ্টায় কলকাতার জিরাট বস্তিতে ১৫৬ বিঘা ১৮ কাঠা ৯ ছটাক জমি অধিগৃহীত হয়। পরের বছর ১লা জানুয়ারি থেকে এখানেই শুরু হয়ে যায় চিড়িয়াখানা তৈরির কাজ।

সেই সময় এই পশুশালা গঠনের দায়িত্বে ছিলেন তিন জন দুই প্রফেসর, জর্জ কিং ও জন অ্যান্ডারসন এবং কার্ল লুই সোয়েন্ডলার নামের এক

জন, পেশায় যিনি ছিলেন ইলেকট্রিশিয়ান। তিন জনই জীবজন্তু বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা খুঁজছিলেন শিক্ষিত ও কর্মঠ এমন এক জনকে, তাঁদের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় কাজ করতে যিনি আগ্রহী হবেন। জর্জ কিং তাঁর প্রাক্তন ছাত্র রামব্রহ্মকে চি-ড়িয়াখানায় কাজে নিযুক্ত করলেন। দিনটা ছিল ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৬, যেদিন প্রথমে অস্থায়ী ভাবে কুলির সর্দার পদে রামব্রহ্মকে কাজে নেওয়া হল। জিরাট বস্তিতে একটা তাঁবুতে থেকে তিনি কুলি ও মিস্ত্রিদের কাজের তদারকি করতেন। আলিপুর পশুশালায় তৈরি হল পশুপাখিদের খাঁচা ও ঘর।। ব্যারাকপুরে লাটবাগানের পুরনো চিড়িয়াখানা থেকেও কিছু পশুপাখি নিয়ে আসা হল।

সেদিন ছিল ৬ই মে, ১৮৭৬ যেদিন সাধারণ মানুষের জন্য চিড়িয়াখানার দরজা খোলা হল। মাত্র ৩১টি বন্যপ্রাণী নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল পশুশালার। কিন্তু তাঁর কর্মদক্ষতার পাশাপাশি জীবজন্তু বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও গবেষণায় আগ্রহ দেখে জর্জ কিং ও অ্যান্ডারসনের সু-পারিশে রামব্রহ্ম চিড়িয়াখানার প্রথম ভারতীয় সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি আলিপুর পশুশালার নামকরণ করেছিলেন 'আলিপুর জীবনিবাস'। পশু-পাখিদের বিজ্ঞানসম্মত নামের উল্লেখও যে থাকা দরকার, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। জীবজন্তুদের স্বাস্থ্য, অসুখবিসুখ, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও তিনি খোঁজ রাখতেন। লিখে রাখতেন, কোন পশুপাখি কেনা হয়েছে, কোনটা দান হিসেবে বা অন্য চিড়িয়াখানা থেকে 'বিনিময়' হিসেবে এসেছে। কোনও জীবজন্তু মারা গেলে তার কারণ অনুসন্ধান করে কমিটিকে জানানোর দায়িত্বও ছিল তাঁর। কিছুদিন বাদে ১৮৭৭ সালে, চি-ড়িয়াখানার ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিটি পশুপাখির আচরণ রেকর্ড করার জন্য একটি "দৈনিক রেজিস্টার" শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই দায়িত্বটিও সান্যালের উপর বর্তায়।

তাঁর রুটিন-বাঁধা জীবনে আনন্দের মুহূর্তও এসেছে বিশেষ বিশেষ অতিথির আগমনে। আলিপুর পশুশালায় যেমন বেড়াতে এসেছেন ছোট-লাট, বড় লাট, বড়লাটের অতিথি হয়ে রাশিয়ার জারের বড় ছেলে, অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ, তেমনই ভারতের রাজা-মহারাজরাও আসতেন সদলবলে।

চিড়িয়াখানায় ফুলের বাগান, সবুজের সমারোহ সবাইকে মুগ্ধ করত। রামব্রহ্ম তাঁদের পশুশালা ঘুরিয়ে দেখাতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী যোগানন্দও চিড়িয়াখানা দেখতে আসেন। জীবজন্তুদের পাশাপাশি চিড়িয়াখানায় মনোরম পরিবেশেরও প্রশংসা করেন তাঁরা। প্রাণীদের বিবর্তন বিষয়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে রামব্রহ্মের আলোচনা হয়েছিল বলে জানা যায়।

তিন মাস বয়সের একটি বাচ্চা জলহস্তীকে কিনে আনা হয়েছিল জাঞ্জিবার থেকে। সুপার রামব্রহ্ম ঘন দুধ, জোয়ার-ভুট্টার বীজ সেদ্ধ করে খাইয়ে তাকে তাজা রেখেছিলেন। তার জন্য ছোট্ট একটি পুকুরও বানিয়ে দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের স্ত্রী গন্ডার ও সুমাত্রার পুরুষ গন্ডারের মিলনে একটি গন্ডারশাবকের জন্ম হয় পশুশালায়। বন্দি অবস্থায় গন্ডারের জন্ম ভারতের চি-ড়িয়াখানার ইতিহাসে এই প্রথম। আলিপুর চিড়িয়াখানার সুনাম দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পরে।

অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁর ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা থেকে একটি ভারতীয় বাঘ, এক জোড়া মালয় দেশের বাঘ ও এক জোড়া চিতাবাঘ, দুটো বাঘিনি উপহার হিসেবে পশুশালায় পাঠিয়েছিলেন। কিছু রঙিন মাছও তিনি উপহার দিয়েছিলেন। নবাবের পাঠানো একটি বাঘিনিকে একবার হামবুর্গ চিড়িয়াখানায় পাঠানোর অনুরোধ আসে। যে সব পশুপাখি বিদেশে পাঠানো হত,

>>৬

এক স্বদেশী ডাক্তারের কাহিনী

মালবিকা সেনগুপ্ত

সাল ১৮৫৭। সিপাহী বিদ্রোহের অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতে। সেই কঠিন বিপর্যস্ত অবস্থায় স্বরূপ চন্দ্র দাসের ঘরে ১৭ই ডিসেম্বর সিলেটে জন্ম নিলেন সুন্দরী মোহন দাস। তাঁর পিতা পরবর্তী কালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এর প্রধান দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত হন।

ছোটবেলা থেকেই সুন্দরী মোহন ছিলেন অসম্ভব মেধাবী। পরবর্তী জীবনে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ঋ.অ. ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে M.B. ডিগ্রী সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

সুন্দরী মোহনের জীবন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় তা ছিল বহু ধারায় প্রবাহিত। একদিকে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ডাক্তার। অপর দিকে ছিল দেশের প্রতি অসীম ভালোবাসা। আবার সাহিত্য রসেও ছিলেন সমান পারদর্শী। বহু কীর্তন গান রচনা করেছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গান পছন্দ করতেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর লিখিত গান গাওয়া হতো।

তিনি অনেক দেশাত্মবোধক গানও রচনা করেন।

স্বদেশ প্রেম ছিল তাঁর মজ্জায় মজ্জায়। সে কারণেই মেডিকেল কলেজে পড়াকালীন নবগোপাল মিত্র আয়োজিত ন্যাশনাল মেলার সদস্য হয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুগামী হয়ে ব্রাহ্ম ধর্মও গ্রহণ করেন।

নারী শিক্ষা ও প্রসূতির স্বাস্থ্যের কথা সর্বদা তাঁকে ভাবাত। প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে তিনি যখন ডাক্তারী শুরু করেন, মেয়েদের - বিশেষতঃ প্রসূতি মায়েদের - নানা অসু-বিধা ও যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নারীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের প্রবল সমর্থক ছিলেন। তাই তাঁর বন্ধু বিপিন চন্দ্র পাল ও অন্যদের সাথে

মিলিত হয়ে নিজের রক্ত দিয়ে সই করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে জীবনে বিয়ে করলে কোনো বিধবা মহিলাকেই বিবাহ করবেন।

এছাড়া তাঁরা দেশ সেবার প্রতিজ্ঞা নেন। যার মূল লক্ষ্য ছিল তাঁরা ভারতীয়দের অধিকার রক্ষা করবেন এবং ব্রিটিশ শাসনের সেবা করবেন না কোনদিনও। বিদেশী পণ্য কিনবেন না ও ব্যবহারও করবেন না। ব্রিটিশ সরকারের সাথে কোনো রকম আপোষ করবেন না এবং নিজস্ব কোনো সম্পত্তি সঞ্চয় করবেন না। তিনি আজীবন এই প্রতিজ্ঞা পালন করে গেছেন। প্রতিজ্ঞা রাখতেই তিনি বিধবা রমণী হেমাঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

ডাঃ দাস কলকাতা কর্পোরেশনের চিকিৎসা বিভাগে যোগদান করেন ১৮৯০ সালে। জনস্বাস্থ্য বিষয়ে নাগরিকদের অবহিত করার জন্যে তিনি "পৌর দর্পন" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তদানীন্তন মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পুরসভার জনস্বাস্থ্য কমিটির সভাপতিও হয়েছিলেন। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে তিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে নাগরিক প্রতিনিধিত্বে জনস্বাস্থ্য সংগঠন তৈরী করা হয়।

স্বাস্থ্য কেন্দ্র গঠন করা হয়। তিনি নার্সিং প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেন। প্রসূতিদের কষ্ট যেহেতু বুঝতে পেরেছিলেন তাই প্রশিক্ষিত ধাইমা নিয়োগে উদ্যোগী হন। শিশু ও হাস-পাতাল রোগীদের জন্য সমবায় পদ্ধতিতে দুধের ব্যবস্থা করেছিলেন। বেসরকারি মেডিকেল সংগঠনের উপরেও তিনি জোর দেন।

তাঁর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি ছিল বিপ্লবীদের ঘাঁটি। নিজে বোমা প্রস্তুত করতেন। বিদেশী শিক্ষা বর্জন ও প্রযুক্তি এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে "জাতীয় শিক্ষা" প্রবর্তনে আগ্রহী হন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদেরও প্রধান সংগঠক ছিলেন। বিদেশী দ্রব্যের বর্জন ও চিকিৎসক হিসেবে সম্পূর্ণ দেশীয় ওষুধ শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হন। তিনি চিত্তরঞ্জন সেবা সদন ও বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্সটিটিউট (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-এর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন।

অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন চন্দ্র পাল, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাঁর ৭৩ সু-কিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। স্বরাজ সমিতির জন্মভিটে এই ৭৩ সু-কিয়া স্ট্রিট। এই সমিতিই পরবর্তী কালে স্বরাজ্য পার্টির জন্ম দিয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা কলেজ বয়কট করেন ও ধর্মঘট ডাকেন। তিনি তাঁদের সমর্থন করেন ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন যা পরবর্তী কালে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ নাম পরিচিত হয়। তিনিই প্রথম প্রিন্সিপাল হিসেবে নিযুক্ত হন।

ডাঃ দাশ ডাক্তারী ও ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত বহু সংস্থানের সাথে যুক্ত ছিলেন। লিখেছেন বহু বই যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর স্বার্থহীন কর্মময় জীবন কলকাতার নাগরিকদের প্রভূত উপকার ও উন্নতি সাধন করেছে।

এই কর্মব্রতী, দেশপ্রেমিক ও নির্ভীক চি-কিৎসক চিকিৎসা জগতে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সদস্য, কার্যকরী সমিতি, ইসনা

আর্গোনমিক্স: কাজে 'আদর্শ পরিবেশ' তৈরির হাতিয়ার

পাতা ১ এর পর>>

অক্ষম শ্রমিক কাজ হারালেও ওই সংস্থার কোনও হেলদোল থাকে না। কারণ, 'বদলি ওয়ার্কার'-য়ের কোনও অভাব নেই এখানে।

উদাহরণস্বরূপ চটকলগুলির কথা বলা যেতে পারে। চটকলের উইভিং সেকশনে (যেখানে পাটের সুতো দিয়ে চটের কাপড় বোনা হয়) সুতোর বুনন যথাযথ রাখতে তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রির কাছাকাছি রাখতে হয়। আর আর্দ্রতা রাখা হয় শতকরা ৯৯ ভাগ। গোটা ঘরে উড়তে থাকে পাটের ছোট ছোট কণা, যারা কর্মীদের নাক মুখ দিয়ে সোজা চলে যায় ফুসফুসের পথে। শ্বাসনালীতে তারা জমতে থাকে। এর ফলে ভয়ঙ্কর শ্বাস রোগের শিকার হন শ্রমিকেরা। যে রোগের পোষাকি নাম নিউমোকোনিওসিস। যে রোগের ফলে ফুসফুস পুরোপুরি বিকল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। অকালেই কর্মহীন হয়ে পড়েন তাঁরা।

শ্রমিকদের এর জন্য কর্মক্ষেত্রে মাস্ক পরে থাকার নির্দেশিকাও জারি করা হয় জুট মিল গুলিতে। কিন্তু এই গরম আর চরম আর্দ্রতায় শ্রমিকদের পক্ষে মাস্ক পরে থাকা সম্ভব হয়না। কাজের প্রক্রিয়ায় সুবিধা করে দিতে ভোগেন শ্রমিকেরা। কর্মীদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। অসুস্থ শ্রমিক পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করেও তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কাজটা করতে পারেননা।

কার্যত ওই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। অক্ষম কর্মীর চাকরি চলে যায়। যতো বেশি বেশি করে অক্ষম কর্মী তৈরি হয়, সমাজের উপরেও চাপও ততো বাড়ে।

আর্গোনমিক্স খুঁজে বের করার চেষ্টা করে কী ভাবে কর্মীরা শরীর ঠিক রেখে অনেক বেশি সময় ধরে কাজ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সংস্থার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। উৎপন্ন সামগ্রিক গুণগত মানও বাড়ে। সংস্থাটি লোকসান কমিয়ে লাভের মুখ দেখে।

কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কী ভাবে এক সক্ষম মানুষকে মাত্র ১৫ বছরে অক্ষম করে দিতে পারে তাঁর উদাহরণ বিট্টু সাহা। কলকাতার রাস্তায় মিনিবাস চালিয়ে এখন পুরোপুরি অক্ষম বিট্টু। তাঁকে একবার স্বচক্ষে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। যে হাড় জিরজিরে মানুষটাকে দাওয়ায় বসে ধুঁকতে দেখেছিলাম মনে হচ্ছিল তাঁর বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই। পরে জানলাম উনিই বিট্টু। আঁধার কার্ডে বয়স দেখাচ্ছে ৩৫। ওই প্রাক্তন মিনি বাস চালক হাত, পা নাড়াতে পারেননা, ফুসফুসে বাসা বেঁধেছে যক্ষ্মা।

কিন্তু এর জন্য ১৫ বছর মিনিবাস চালানোর পেশা কেন দায়ী? আমরা তো বাসে, মিনিবাসে যাতায়াত করি। কিন্তু যিনি যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে দায়বদ্ধ, তিনি বাসের মধ্যে কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তা কি কখনও লক্ষ্য করে দেখেছি? বাসের সব থেকে ছোট্টো জায়গাটা বরাদ্দ ওই চালকের জন্য। শুধু ছোট্ট জায়গা নয়, বাসের মধ্যে সব থেকে অস্বাস্থ্যকর জায়গাটি ওই চালকের বসার জায়গা।

ড্রাইভারের কেবিনের আশপাশে একদন্ড দাঁড়ানো যায় না। ইঞ্জিন থেকে তাপ বেরোচ্ছে যে! এই প্রচন্ড তাপের মধ্যে আট ঘণ্টা গাড়ি চালাতে হয় চালককে। কখনও তার থেকেও বেশি সময়। একটু বাড়তি আয়ের জন্য।

শুধু কি উচ্চ তাপ? ইঞ্জিন থেকে গল গল করে কালো ধোঁয়া বেরোয় সর্বক্ষণ। সেই গরম কালো ধোঁয়া নাক মুখ দিয়ে ঢুকে শ্বাসনালীকে পোড়াতে পোড়াতে ফুসফুসের দিকে রওনা হয়। সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোবেঞ্জিনের মতো বিষাক্ত গ্যাস। প্রতিদিন ফুসফুস একটু একটু করে ঝাঁঝরা হতে থাকে।

শুধু কি তাই? যে স্টিয়ারিংটি ধরে চালক গাড়ি চালান তাঁর অবস্থাটা কখনও দেখেছেন? সব সময় সেটি থরথর করে কাঁপছে। আর চালক সেটি হাতে ধরে বসে থাকেন সারাদিন। স্টিয়ারিংয়ের কাঁপুনিতে শুধু হাত নয়, কাঁপতে থাকে চালকের সারা শরীর। স্নায়ুর উপরে প্রচন্ড চাপ পড়ে। কত যে পেশি ছিঁড়ে যায় তার হিসেব নেই। শরীরে পুষ্টিকর খাবার যায় না। ফলে ছিঁড়ে যাওয়া পেশি মেরামত হয় না। ধীরে ধীরে হাত পায়ের সাড় বন্ধ হয়ে যায়। অকাল বার্ধক্য শরীরকে গ্রাস করে দ্রুত। তাঁরা সমাজের বোঝা হয়েই থেকে যান বাকি জীবনটা। যেমনটা হয়েছে আমার গাড়ির চালকের দাদার ক্ষেত্রে।

আর্গোনমিক্স বিভিন্ন পেশার এই সব অসঙ্গতি দূর করে এমন কর্ম পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করে যেখানে একজন শ্রমিক তাঁদের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করতে পারেন। পাশাপাশি যন্ত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর হয়ে সঠিক কর্ম পরিবেশ তৈরি হয়। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ এমন হয় যা কর্মচারী ও যন্ত্র উভয়ের ক্ষেত্রেই অনুকূল। এটাই কিন্তু আদর্শ কর্ম পরিবেশ। তাই সে বাড়ির রান্নাঘরই হোক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম অথবা কারখানার ফার্নেস।

আজকাল সবাই প্রশস্ত রান্নাঘর পছন্দ করেন যাতে হাওয়া খেলে। গ্যাস পুড়ে তৈরি হওয়া কার্বন ডাই অক্সাইড অনেকটা জায়গা পেলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব অনেকটাই কমে যায়।

রান্নাঘরে আজকাল অনেক মানুষ চিমনিও ব্যবহার করে থাকেন। যা রান্নার ফলে তৈরি গরম হাওয়াকে চিমনি টেনে এনে বাইরে বের করে দেয়।

খুব ছোট ছোট পরিবর্তনে কিন্তু অসহনীয় কর্ম পরিবেশ সহনীয় হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে একটি কর্পোরেট সংস্থার উদাহরণ দিলেই বিষয়টি জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওই সংস্থায় একসঙ্গে অনেকগুলি পিসি অর্থাৎ পার্সোনাল কম্পিউটার চলে। ঘরের মধ্যে তীব্র আলো জ্বলে ২৪ ঘন্টা। ঝকঝকে দুধ সাদা সিলিং (ছাদের নীচটা)। তাতে আলো পিছলে যায়। এ হেন টিপটপ অফিসে বসে কম্পিউটারের সামনে বসেই মনে হয় চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। মনোনিবেশ করা যাচ্ছে না। এটা এক ধরণের আলোর দূষণ। এত খরচ করে তৈরি করা অফিস, অথচ সেখানে পিসি-তে বসলেই যত সমস্যা।

এবার দেখা যাক সেখানে সঠিক কর্ম পরিবেশ তৈরির জন্য এক আর্গোনমিস্ট কি কতে পারেন? ওই সুসজ্জিত অফিসটি একবার নতুনভাবে তৈরি হল। তখন ডাক পড়ল একজন আর্কিটেক্টয়ের। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন এক ডিজাইনারকে, যিনি নকশা করার সময় আর্গোনমিক্সের নীতির সাহায্য নেন। তাঁর নির্দেশ মতো সিলিং হল অনেক উঁচু, যেমন ব্রিটিশ আমলের বাড়িগুলিতে থাকে। আর সিলিংয়ের রঙ করা হল কালচে সবুজ। ওই রঙটা অবশ্য কর্মীদের মনঃপুত হলনা। তাঁদের মনে হল, আগের অফিস অনেক বেশি ঝকঝকে ছিল। সিলিংয়ের রঙটাই সব জৌলুস নষ্ট করে দিয়েছে। এবার যখন সব পিসি চালু হল, সব আলো জ্বলল কর্মীরা অবাক। আধঘন্টা যায়, এক ঘন্টা যায়, কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছেনা তো! এতটুকুও আলোর সমস্যা (গ্লেয়ার) নেই। স্ক্রিনের উপরে বাড়তি আলো পড়ছেনা। স্ক্রিনে বেশিক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে না। কখন যে সময় কেটে যাচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে না। এটাই ফলিত আর্গোনমিক্স। তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে প্রায়শই কর্মীরা এই গ্লেয়ারের সমস্যায় ভোগেন। তাতে কাজের মান নষ্ট হয়।

তবে আর একটি পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিতে। যাঁরা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কাজ করেন তাঁদের অনেকেরই পিঠের ব্যাগ ঘাঁটলে এই চরম গ্রীষ্মেও দেখা মিলতে পারে সোয়েটার, মাফলার কিংবা মাঙ্কি ক্যাপের। কারণ, যন্ত্রের অর্থাৎ কম্পিউটারের সঠিক দেখভালের জন্য কর্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক তাপমাত্রা এতটাই কম রাখা হয় যে, সারা শরীর গরম পোশাকে ঢেকে রাখতে হয় যন্ত্র ব্যবহারকারীকে। চাকরি বাঁচাতে ওই প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে জোর করে খাপ খাইয়ে নিতে হয় যন্ত্রীকে।

এতে যেমন শরীরের উপরে চাপ পড়ে, চাপ পড়ে মনের উপরেও। কিন্তু মুখে কিছু বলা যাবেনা। এই এতগুলি প্রতিকূলতা কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। যন্ত্রের জন্য মানুষ না মানুষের জন্য মানুষ সেই প্রশ্নটা তাই উঠতেই থাকে।

কর্মক্ষেত্রে কাজের মান রাখতে কর্মীকে কিন্তু তাঁর 'কমফোর্ট' জোনের মধ্যে কাজ করতে দিতে হবে। অনেকে অসহনীয় পরিবেশে কর্মীদের কাজ করিয়ে নেন বাড়তি টাকা বা ইনসেনটিভ দিয়ে। সেটা কিন্তু আর্গোনমিক্সের নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। গরীব দেশগুলিতে অবশ্য এটাই দস্তুর। এমনও দেখা যায় যে যন্ত্রটি কোনও কর্মীর পক্ষে চালানো অসম্ভব হলেও সেই অসাধ্য সাধন করতে বাধ্য করা হয় তাঁকে। এতে কাজের মান নেমে যায়, দুর্ঘটনার প্রবণতা বাড়ে। এমনকী কর্মীর শারীরিক ক্ষতিরও আশঙ্কা দেখা দেয়। কারণ, যন্ত্র আর যন্ত্রীর মধ্যে যে ভারসাম্য থাকা উচিত তা নষ্ট হয়ে যায়।

সেটা আবার কি? একটা উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের দেশে যখন কয়লার ইঞ্জিনের পরিবর্তে লোকো ইঞ্জিন অর্থাৎ ডিজেল/ইলেকট্রিক আনার কথা হল, তখন জাপান থেকে প্রশিক্ষণের জন্য আনা হয়েছিল লোকো ইঞ্জিন। সঙ্গে জাপানের প্রশিক্ষক। ভারতীয় চালকেরা টপাটপ সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু ইঞ্জিন চালানোর সময় ঘটল বিভ্রাট। ইঞ্জিনের বিভিন্ন সুইচ, বোতাম, লিভারের সঙ্গে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছেন না ভারতীয় চালকেরা। যেখানে এক হাতে একটি স্টিয়ারিং ধরে রেখে, অন্য হাতে একটি সুইচ টেপার কথা, সেখানে যে কোনও একটি কাজ করতে পারছেন ভারতীয় চালকেরা। ফলে ইঞ্জিন হোঁচট খাচ্ছে। দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। অথচ জাপানি প্রশিক্ষকেরা যখন চালাচ্ছেন দিব্যি চলছে ইঞ্জিন। ভারতীয় চালকেরা তাহলে কি অকর্মন্য? মোটেই না।

দেখা গেল জাপানিদের গড়পড়তা উচ্চতা ভারতীয়দের থেকে অনেক বেশি। তাঁরা দুটি হাত বিস্তৃত করলে তো দুই দিকে যতদূর পৌঁছয় (স্প্যান), ভারতীয়দের পৌঁছয় তার থেকে অনেক কম। ওই ইঞ্জিনে বিভিন্ন সুইচ, লিভার, বোতাম লাগানো হয়েছে জাপানিদের শরীরের হাত, পা, হাতের আঙুল, উচ্চতা ইত্যাদির গড়পড়তা পরিমাপের নিরিখে। ভারতীয়েরা তাই ডান দিকে থাকা লিভারে হাত রেখে বাঁ দিকের বোতামে হাত পৌঁছতেই পারছেন না।

এরপরে ভারতীয়দের গড়পড়তা পরিমাপের ভিত্তিতে তৈরি হল নতুন লোকো ইঞ্জিন। ভারতীয় চালকেরা তখন সবাই একশ'তে একশ। কারণ যন্ত্রের সঙ্গে মানব যন্ত্রের সমন্বয় হয়েছে যথাযথ। অর্থাৎ যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রীর, যন্ত্রের সঙ্গে পরিবেশের এবং যন্ত্রীর সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য যখন যথাযথ থাকে, তখনই কাজের গতি আর মান-দুটোই বাড়ে।

আমি নিজে কাজ করেছি ট্যানারিতে। সেখানে যেমন রাসায়নিক দূষণ, শব্দ দূষণ, কম আলোর দূষণ, বায়ু চলাচলের অভাব, উচ্চ তাপমাত্রা ও বেশি আর্দ্রতার দূষণ কিংবা জল ও বায়ু দূষণ আছে, তেমনই আছে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রীর সমন্বয়ের অভাব। এ ছাড়া ভালো ট্যানিংয়ের জন্য একটি যন্ত্র আনা হয়েছিল জার্মানি থেকে। সেখানে একটা পা-দানি পা দিয়ে চেপে রেখে যন্ত্রটি সচল রাখতে হত। ওই পা-দানিকে চেপে রাখতে পায়ের যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করতে হয়, আমাদের এখানকার একজন শ্রমিকের সেই পরিমাণ শক্তিই নেই।

মালিক বেশি চাপাচাপি করলে অনেক সময় শ্রমিকেরা যন্ত্রের অন্য যন্ত্রাংশ খুলে রেখে দিতেন। আসলে জার্মানি বা ইউরোপের মানুষের শারীরিক গঠন অনুযায়ী তৈরি হয়েছিল ওই যন্ত্র। আমাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে জার্মানি থেকে লোক এসে আমাদের এখানকার শ্রমিকদের দেহের পরিমাপের ভিত্তিতে নতুন নকশার পা-দানি তৈরি করে দেয়। তারপরে প্রায় কোটি টাকার যন্ত্রটি সচল হয়। অর্থাৎ ওই ট্যানারির শ্রমিকদের ব্যবহারযোগ্য হয়। যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা ভীষণ জরুরি। আমরা যে সব যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার নিত্য দিনের কাজে ব্যবহার করি তার সব ক'টিই কোনও না কোনও মানব অঙ্গের আদলে তৈরি হয়েছে। যেমন ক্রেন। যার আদলটা মানুষের হাতের মতো। এ যেন কুম্ভকর্ণের মত কোনও এক দৈত্যের হাত কোনও জিনিস তুলছে।

আপনি যদি ফাঁকা বাস বা ট্রেনে ভাগ্যবশত উঠে পড়তে পারেন, তাহলে প্রথমেই যেটা করেন তা হল বিভিন্ন আসনে বসে জরিপ করে কোনটা আপনার কাছে অধিক আরামের। অর্থাৎ আপনার পায়ের পেশি, পেটের পেশি, কোমরের হাড় কিংবা ঘাড়ের উপরে যখন কম চাপ পড়ছে। আপনি তখন কমফোর্ট জোনে আছেন। কাজের চেয়ারে বসার সময় মেরুদন্ড রাখতে হয় সোজা, তাই আর পায়ের নীচের অংশের মধ্যে যে কোণ তৈরি হয় তা হবে ৯০ ডিগ্রি। পায়ের পাতা রাখার জন্য থাকবে ফুট রেস্ট। কাজের মাঝে একটু কোমর ও মেরুদন্ড আপনি আগুপিছু করে নিতে পারবেন।

আবার আপনার কাজের টেবিলের উচ্চতা এমন হবে যাতে কম্পিউটার চালানোর সময়ে আপনার কনুই নীচের অংশ উপরের অংশের সঙ্গে ৯০ ডিগ্রি কোণে থাকে। তাহলেই এড়ানো যাবে কোমর, ঘাড়, গলা, নিতম্বের পেশীর যন্ত্রণা। অর্থাৎ আপনি কমফোর্ট জোনে থাকবেন।

আর্গোনমিক্স একটি আদর্শ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বিষয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে আর্টের মেল বন্ধন। একই ভাবে আপনার পিঠে মাল তোলার ভঙ্গি, মাথায় মাল তোলার ভঙ্গি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে সংশ্লিষ্ট পেশীগুলি কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে এলেই শুরু হয়ে যাবে ব্যাথা। ওই ব্যাথাই আমাদের নির্দেশ দেবে আমি কি ভঙ্গিতে দাঁড়ালে আমি কমফোর্ট জোনে থাকব।

কর্মক্ষেত্রে আমরা তাই যত বেশি আর্গোনমিক্সের নীতি কার্যকর করব তত আমাদের কাজটা 'সহজ' হয়ে যাবে। কর্মীদের কাজটা যত সহজ হবে তত উৎপাদন বেশি হবে, উৎপাদিত পন্যের গুণগত মান ভালো হবে। আর কর্মীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে বাড়তি টাকা। একই সঙ্গে মালিকদের অ্যাকাউন্টেও। পুরোপুরি সুস্থ থেকেই অবসর নিতে পারবেন ওই কর্মী। সমাজের বোঝা হয়ে যাবেন না। সব ভালো যার শেষ ভালো।

বরিষ্ঠ সাংবাদিক এবং অধ্যাপক,
রাণী রাসমনি গ্রীন ইউনিভার্সিটি

প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের সন্ধানে

তুহিন সাজ্জাদ শেখ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস প্রতিবছর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আমরা প্রকৃতির কাছে কতটা ঋণী। এবছরের প্রতিপাদ্য "প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করি" নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী, তবে পরিবেশ সুরক্ষায় আরও কিছু চিন্তার দ্বার খুলে দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান বাস্তবতায় পরিবেশ নিয়ে ভাবনার পরিধি শুধুই দূষণরোধে সীমাবদ্ধ না রেখে, সহাবস্থান, পুনরুজ্জীবন ও দায়িত্বশীল জীবনচর্চার দিকে প্রসারিত হওয়া জরুরি।

নগরের সবুজায়ন এ প্রসঙ্গে একটি কার্যকর ধারা। ছাদবাগান বা উর্ধ্বমুখী বনায়ন শুধু অক্সিজেন জোগায় না, বরং শহরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনে। দ্বিতীয়ত, ইকো-ফ্যাশন বা পরিবেশবান্ধব পোশাক আজকের ফাস্ট ফ্যাশনের যুগে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক তন্তু, পুনর্ব্যবহৃত কাপড়, ও ন্যায্য শ্রম ব্যবস্থার প্রতি জোর দেওয়া প্রয়োজন।

পরিবেশের প্রশ্নে শুধু বস্তুগত নয়, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও জরুরি। "প্রকৃতির অধিকার" ধারণাটি আমাদের শেখায়, নদী, বন, জীবজন্তু কেবল সম্পদ নয়, তাদের নিজস্ব অস্তিত্ব ও অধিকার রয়েছে। একইভাবে, পরিবেশ-সাহিত্য বা জলবায়ু কল্প-কাহিনী, ইংরেজি ভাষায় যাকে আজকাল নাম দেওয়া হয়েছে ক্লাই-ফাই বা ক্লাইমেট ফিকশন, আমাদের পরিবেশ-চেতনায় নতুন ভাষা যোগ করে। গল্প, কবিতা বা নাটকের মাধ্যমে পরিবেশ বার্তা আরও সহজে পৌঁছে দেওয়া যায়।

টেকসই খাদ্যাভ্যাসও পরিবেশ সংরক্ষণে বড় ভূমিকা রাখে। স্থানীয় ও মৌসুমি খাদ্য বেছে নেওয়া, খাদ্য অপচয় রোধ, এবং উদ্ভিদভিত্তিক আহার গ্রহণ এসবই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে একটিমাত্র ডাইনিং টেবিলে দৃশ্যমান প্রতিরোধ। এদিকে স্মার্ট সিটির ধারণা যদি প্রকৃতি-বান্ধব প্রযুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, যেমন সৌরশক্তি, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তাহলে শহরও হয়ে উঠতে পারে পরিবেশের মিত্র।

শহরের প্রান্তিক প্রাণীরা, পাখি, মৌমাছি, বাদুড় বা গিরগিটি, তাদের অস্তিত্বও আজ হুমকির মুখে। সহাবস্থানের নীতি মেনে চললে মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়ের জন্যই এই শহর নিরাপদ হয়ে উঠতে পারে।

পরিবেশ দিবস কেবল একটি দিনের আয়োজন নয়, বরং একটি চলমান প্রতিশ্রুতি নিজের জীবনে, সমাজে এবং প্রশাসনিক স্তরে টেকসই, ন্যায্য এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবর্তন আনার। এই পরিবর্তনই ভবিষ্যতের পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে।

প্রাক্তন ছাত্র, ইসনা

কিশলয়ের আঙিনায়

Rishaan Choudhury
- 5 years
Reception Whales Class
The British School of
Beijing, China

Soujanya Banerjee
Class -III
Lions Calcutta
Greater Vidya Mandir

Somdeep Ghosh
Class IX, Section D
Bhavans Gangabux
Kanoria Vidyamandir

রাজ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

তন্ময় পাল

জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ দ্বারা পরিচালিত বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড যা পশ্চিমবঙ্গের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি অনন্য প্রতিভা অন্বেষণমূলক প্রতিযোগিতা। এই বছরের বিদ্যাসাগর সাইন্স অলিম্পিয়াড এর রাজ্যজুড়ে ব্লক স্তরে প্রথম ধাপের পরীক্ষাটি আগামী রবিবার, ১৫ জুন, (দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টে), নেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এবং জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ এর যৌথ উদ্যোগে এই অলিম্পিয়াড, ২০২৫ সালে চতুর্থ বার সম্পন্ন হতে চলেছে। প্রথম স্তরের পরীক্ষায় ৪০,৭৫১ ছাত্রছাত্রী/পড়ুয়া সমগ্র রাজ্যের ৮,৪৬২ বিদ্যালয় থেকে আবেদন করেছে, যা এই উদ্যোগটির সূচনা-লগ্ন থেকে সবথেকে বেশি সংখ্যা। বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড-এর বিজয়ীরা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বৃত্তি, প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক সুযোগ লাভ করে।

পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার পটভূমিতে জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ একটি উজ্জ্বল নাম। রাজ্যের স্কুল পড়ুয়াদের জন্য এক অভিনব উদ্যোগ - বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড। জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ-এর এই উদ্যোগ বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন প্রতিশ্রুতি, যা বিশেষভাবে রাজ্যের নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজিত হয়। প্রসঙ্গত, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড-এর প্রচলন থাকলেও রাজ্যে এতদিন এই ধরণের উদ্যোগ ছিল না ।

এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন তথা উন্নতি ঘটানো এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান, গণিত ও যুক্তিভিত্তিক চিন্তাধারার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করা ও তাদের প্রতিভার যথাযথভাবে উন্মেষ ঘটানো। এই অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান নয়, বরং বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাও অর্জন করে। এটি তাদের উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং ভবিষ্যতের জন্য একজন গবেষক, বিজ্ঞানী কিংবা উদ্ভাবক হওয়ার ভিত্তি গড়ে তোলে।

জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ এর উদ্যোগে বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড, একটি ত্রিস্তরীয় পরীক্ষা পদ্ধতি। এর বিভিন্ন ধাপ তথা স্তরগুলি এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক। বর্তমানে যারা নবম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী, যারা পশ্চিমবঙ্গে কোন সরকারি তথা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে পাঠরত, তাদের মধ্যে থেকে প্রথম পাঁচজন যোগ দিতে পারবে এই অলিম্পিয়াড পরীক্ষায়। তাদের নাম পাঠাবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা।

রাজ্যের স্কুলস্তরের ভৌতবিজ্ঞান, গণিত ও জীবনবিজ্ঞানের (অষ্টম শ্রেণীর) সিলেবাসের উপর পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে। প্রথম স্তর থেকে সফল ১০% ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পরীক্ষার দ্বিতীয় ক্রমটি অনুষ্ঠিত হবে, যা হবে জেলা স্তরের পরীক্ষা। বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড এর অন্তিম স্তরটি রাজ্যস্তরের পরীক্ষা যা

>>৭

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

ছোটদের জন্য গ্রীন ক্যাম্প

টিনা মুখোপাধ্যায়

এবিশ্বকেশিশুরবাসযোগ্য করে যাবো আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার 'এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স একাডেমী (নেসা), কলকাতা চ্যাপ্টার, ও মেঘমা আর্ট এন্ড মিডিয়া রিসোর্স সেন্টার , এক অন্য আবহে পরিবেশ দিবস, ২০২৫ পালন করল । জুন মাসের ৩ এবং ৪ তারিখে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের ডঃ এন. আর. সেন অডিটোরিয়ামে এই দুই সংস্থার সহযোগে ছোটদের জন্য একটি গ্রীন ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয় । এই ক্যাম্পের প্রধান শ্রোতা ও অংশগ্রহণকারীরা পুরোটাই ছিল কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কচিকাঁচারা, মূলত তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা । পুরো অনুষ্ঠানটির সহযোগিতায় ছিল প্রজেক্ট রাইস এবং বুরহানি ফাউন্ডেশন ।

দুদিনের গ্রীন ক্যাম্পের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ছোটদেরকে পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা, তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা, কারণ আজকের ছোটরাই আমাদের ভবিষ্যতের কান্ডারি ।

অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স একাডেমির সভাপতি ড: অমিত কৃষ্ণ দের উদ্বোধনী ভাষণ এবং 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে দিয়ে। এরপর শুরু হয় ছোটদের নিয়ে পাবলিক স্পিকিং বা বক্তব্যের আসর, যেখানে তাদের ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হয় বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়। বিষয়গুলি নিয়ে গ্রুপের সবাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এবং

তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য সকলের সামনে রাখে। পুরো পাবলিক স্পিকিং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমতি মিনি জোসেফ, যিনি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ইংরেজির শিক্ষিকা। এর পর ছোটদেরকে মধুবনী আর্ট ও প্রাকৃতিক রং সম্পর্কে জানান মেঘমা আর্ট সেন্টারের মেন্টর শ্রীমতি রানী ভবানী।

শ্রীমতি ভবানী তাদের সকলকে একটি মধুবনী আর্ট - এর নকশা দেন, যেটি তারা নিজেদের মতো বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে সাজিয়ে খুব সুন্দর করে প্রদর্শন করে। এরপর ছোটদের পরিবেশ নিয়ে দুটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম দেখানো হয়, যেগুলি তৈরি করেছে সিস্টার নিবেদিতা ইউ-নিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানটি শেষ হয় প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ড: শ্রাবন্তী বসুর ছড়ার মাধ্যমে ছোটদের প্রকৃতিকে চিনতে শেখানো দিয়ে।

গ্রীন ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিন এর প্রথম চমক ছিল প্লাষ্টিক রিসাইক্লিং-এর একটি কর্মশালা। দায়িত্বে ছিলেন ড: সীমা মুখোপাধ্যায়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫-এর বিষয়বস্তু ছিল 'বিট প্লাষ্টিক পলিউশন' বা প্লাষ্টিক দূষণকে রোধ করতে হবে। সেই কথা মাথায় রেখে ছোটদেরকে শেখানো হয় প্লাষ্টিক পুনর্ব্যবহারের বিভিন্ন কৌশল। ছোটরা চিপস এর প্যাকেটকে রিসাইকেল করে একটি করে বুকমার্ক বানিয়েছিল।

এরপর ছিল তাদের জন্য একটি কুইজ প্রতিযোগিতা, যেটির সঞ্চালনা করেন ন্যাশনাল এনভিরনমেন্টাল সায়েন্স একাডেমীর সদস্যা ড: টিনা মুখার্জী। ছোটদের মাছ নিয়ে অনেক কথা জানান আইসি-এআর-এর প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক ড: বি কে মহাপাত্র।

এরপর ছিল খুবই মজার ও আনন্দের একটি অনুষ্ঠান, যেখানে বুরহানি ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে প্রতি অংশগ্রহণকারীকে দেওয়া হয় একটি করে বার্ড ফিডার। প্রত্যেককে এই বার্ড ফিডারের গুরুত্ব ও ব্যবহার শেখানো হয়। এই বার্ড ফিডার বিতরণের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল 'সেভ আওয়ার হাউস স্প্যারো ' বা 'চড়াই পাখি বাঁচাও project - যাতে ছোটরা, নিজেদের উদ্যোগেই এই বিপন্নপ্রায় পাখিটির পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব নিজেরাই নিতে শেখে।

দু দি ন - ব্যা পী অনুষ্ঠানটিতে নেসা থেকে উপস্থিত ছিলেন ড: কৃষ্ণেন্দু দাস, ড: শুভেন্দু বিকাশ পাত্র প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, নেসার তরফ থেকে ড: শুভেন্দু বিকাশ পাত্র আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সবশেষে, মাইকেল জ্যাকসন এর 'হিল দি ওয়ার্ল্ড' গানটিতে প্রত্যেক খুদের সমবেত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। দুদিনের ক্যাম্পটি যথার্থই সার্থকতা লাভ করেছিল প্রতিটি খুদের উৎসাহী অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।

সদস্যা, নেসা

মামা-ভাগ্নে যেখানে, বিজ্ঞান আছে সেখানে

তুহিন সাজ্জাদ শেখ

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে ক্লাস টু অর্থাৎ সাত বছর বয়স পর্যন্ত কোন স্টুডেন্টকে হোমওয়ার্ক দেওয়া উচিত নয়। পরিসংখ্যান বলছে হোমওয়ার্ক দেওয়ায় শিশুর মনে ও মস্তিষ্কে বাড়তি চাপ পড়ে। ফলে হিতে বিপরীত হচ্ছে।

একটি শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ হওয়ার চাইতে তাদের মনোযোগ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তারা ক্রমশ যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। স্বাভাবিক সৃজনশীলতার প্রকাশ তো দূরের কথা, দৈনন্দিন জীবনধারায় আজকাল তাদের উৎফুল্ল উপস্থিতির দেখা পাওয়াই বিরল হয়ে উঠছে!

তবে ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২১ এবিষয়ে বেশ সক্রিয় ভাষায় নির্দেশ দিয়েছে। এখন তা বাস্তবে প্রয়োগ হলেই বাঁচি। গত দুদিন ধরেই আমার ভাগ্নে রিফাত কেমন যেন মিইয়ে পড়েছে ঐ হোমওয়ার্কের চাপে। বাড়িতে বিয়ের মতো আনন্দ অনুষ্ঠানেও যেন তার কোন মন নেই। মন তার পড়াশোনাতেও নেই, তবুও যেন একপ্রকার জোর করেই বই খাতা পেন্সিল এসব নিয়েই মাথা চুলকাচ্ছে!

ওকে দেখে আমি একটু কষ্টই পেলাম, ভাবলাম দেখি ওকে যদি একটু হালকা করে দিতে পারি।
ওর পাশে বসতেই দেখলাম ও বিজ্ঞান বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে, আর তাতেই ওর মাথা ব্যাথা।

আমি তখন ওকে বললাম, মামা চল, এখন এইসব ভারি ভারি বিজ্ঞানের তত্ব না পড়ে একটু খানি বিজ্ঞান কৌতুক, যাকে বলে সায়েন্স জোকস্ নিয়ে একটু কথা বলি, মানে মজা করি। ও তো অবাক, বলে ওঠে, মামা বিজ্ঞানের আবার জোকস্ হয় নাকি? দেখনা এসব পড়তে পড়তে আমার মাথা ঘুরছে!

বেশ বেশ রিফাত বাবু তা এবার বলতো পরমাণুকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না কেন? তা তো জানি না মামা। কেন, কেন? কারণ ওরা সব কিছু গড়ে তোলে, জোড়া দিয়ে দেয় (মিথ্যে বানায়)! ও, তাই বুঝি! হ্যাঁ, তাইই। জানো বিজ্ঞানীরাও পরমাণুকে ঠিকঠাক বিশ্বাস করেন না!

ও মামা এটা তো জানতাম না। তাহলে আর বলি কি! পরমাণুরা একটু চাপে পড়লেই ভেঙ্গে পড়ে! বুঝেছি ব্যাপারটা। মামা, তোমার কি গরম লাগছে? এসিটা একটু বাড়িয়ে দিই। সে কি কমানো আছে নাকি? আজকাল যা গরম পড়েছে, দে, দে একটু ঠাণ্ডা হই।

মামা তাহলে আমি একটা জোকস্ শোনাই। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, শোনা দেখি। আচ্ছা মামা এই জলবায়ু যদি কবি হোত, তবে কি বলত জানো? নাঃ, তুইই বল। জলবায়ু সাহিত্যের ভাষায় বলে উঠত, আমি আর বরফ নই, আমি এবার গলতে চাই। চমৎকার বললিতো ব্যাপারটা। ক্লাইমেট চেঞ্জ, অ্যাঁ!

আচ্ছা রিফাত এবার বলতো, পৃথিবী কেন ডাক্তারের কাছে গেল? কি যে বলো না মামা, পৃথিবী যাবে ডাক্তারের কাছে, ও কি মানুষ নাকি! সেই তো রে! ওরে, পৃথিবীর যে ভীষণ জ্বর, হু হু করে বাড়ছে গ্লোবাল টেম্পারেচার, আর তাতে চাকা, চাকা বরফ (গ্লেসিয়ার) গলছে। বুঝেছিস। মাথায় রেখে দিস এগুলো, ভবিষ্যতে কাজে আসবে কিন্তু। আচ্ছা মনে রাখব।

তা মামা জলবায়ু পরিবর্তন কি সত্যিই খুব ভয়ঙ্কর গো? কি যে প্রশ্ন করিস না, মারাত্মক মানে, এতটাই মারাত্মক যে পেঙ্গুইনরাও এখন সানস্ক্রিন খুঁজছে! আসলে ভাগ্নে কি হয়েছে জানিস, পৃথিবী যখন বলল যে তার ভীষণ গরম লাগছে, তখন বিজ্ঞানীরা বললেন, এর জন্য তুমি নও, তোমার ভিতর যারা বাস করে, অর্থাৎ ওই মানুষগুলো দায়ী!
মামা, আমরা খুব খারাপ তাই না বলো? আরে ছাড় এসব, এই বয়সে এত গম্ভীর হয়ে গেলে চলবে? খেলবি, দৌড়োবি, নাচবি, গাইবি। তবেই না ছেলেবেলা!
আচ্ছা মামা তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে?
এইরে, এটা কিরকম প্রশ্ন?
আচ্ছা ওসব বাদ দাও। তুমি এআই মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কথা শুনেছ নিশ্চয়ই?
জি মামা, আমি একটু একটু বুঝি। বেশ বেশ, তা বলো তো, এআই প্রেমে পড়লে কি হয়? সে আইডিয়া তো আমার নেই, আমার তো এখনো প্রেমের বয়স হয়নি। তা ঠিক। জেনে রাখো, এআই প্রেমে পড়লে ওর হার্টবিট বাড়ে না, বরঞ্চ ওর সার্ভার ওভারলোড হয়ে যায়!
আচ্ছা ও ওর প্রেমিকাকে কি বলে ডাকে? কি বলে ডাকে মামা, নিশ্চয়ই ডার্লিং বা ওইরকম কিছু একটা?
দূর পাগল, ও ওর প্রেমিকাকে বলে, তুমি আমার অ্যালগরিদমের ফাইনাল আউটপুট! ভয়ঙ্কর মামা ভয়ঙ্কর!
তবে আর বলি কি৩ জানো চ্যাটবট প্রেমে পড়লে কি ভাবে বোঝা যায়? না মামা, তোমার মুখেই শুনবো, তুমি এতো মজার মজার কথা বলছ যে আমার হাসি আর থামতে চাইছে না।
বলনা, কিভাবে চ্যাটজিপিটির প্রেমে পড়া বুঝব? ও বারবার জিজ্ঞেস করে, ডু ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ দিস কনভারসেশন?
ওঃ, মামা তুমি একটা জিনিয়াস। সবই কেমিস্ট্রি ভাগ্নে, সবই কেমিস্ট্রি। এই যেমন ধরো একজন ফিজিসিস্ট একজন বায়োলজিস্টের সঙ্গে এবেলা ওবেলা ব্রেকআপ করে, কেন জানো, কারণ তাদের মধ্যে কোন কেমিস্ট্রি নেই!
কতক্ষন ধরে তোদের দুজনকে ডাকছি বলতো, দুজনের কি হয়েছে তোদের এত হাসি মামা ভাগ্নে জুটিতে।
ও মা, তুমি এসে গেছ। ও, আমার ফেভারিট স্যান্ডউইচও এসে গেছে।
তুমিও বস না মা, দেখনা মামা আর আমি হাসতে হাসতে কি রকম বিজ্ঞান বিজ্ঞান খেলছি। তুমিও মজা পাবে!

বিজ্ঞান সাংবাদিক ও সদস্য, কার্যকরি সমিতি, ইসনা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

সুজলা সুফলা বসুন্ধরা

নবীনা রায় মজুমদার

"আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে কোলের সন্তানে তব কুলের ভিতরে অঞ্চলতলে ওগো মা মৃন্ময়ী।
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই"....

শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত যে প্রকৃতির হাতে প্রাণীকুলের লালন পালন হয় সেই প্রকৃতি আজ চরম দুর্দশায়। বছরে একটি দিন বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস পালনের নামে হইহুল্লোড় হয় ঠিকই, তবে সারা বছর পৃথিবীর হাল হকিকত নিয়ে ভাবার মানুষ কমই আছে। সিংহভাগ মানুষ রোজই ক্ষতিসাধন করে চলেছে বসুন্ধরার। দিনের পর দিন উষ্ণায়ন বেড়েই চলেছে। আর কিছু বছর পর পৃথিবীর অবস্থা কি হবে, কখনো ভেবে দেখেছেন?

একের পর এক বিপর্যয় দেখেও মানুষ সতর্ক হয় না। গরম পড়তেই এসি লাগানোর কথা ভাবি আমরা। কিন্তু ক'জন গাছ লাগানোর কথা ভাবি বলতে পারেন? হয়তো হাতে গোনা কয়েকজনের ভাবনা আছে এরকম। আর তারা তা করেনও। আচ্ছা, আমরা যদি এই রকম ভাবে ভাবি যে প্রতিদিন যদি নিয়ম করে একটি গাছ লাগানো যায় তাহলেই তো আগামীতে গরম নিয়ে হা হুতাশ করতে হয় না। বন্যা কিংবা খরার প্রকোপে ভিটেমাটি ছাড়তে হয় না।

বিজ্ঞানীরাও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন প্রতিনিয়ত। তারা জানাচ্ছেন দিন দিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে পৃথিবী। দূষণে ভরেছে উন্নত সব দেশ। আধুনিক পৃথিবী দেখাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেই কোথাও চরম খরা, কোথাও বা ভয়াবহ বন্যা হয়েই চলেছে। এভাবে কি প্রকৃতি মায়ের ঋণশোধ করা যায়? সকলে মিলে দায়িত্ব নেওয়া যায় না পৃথিবীর? সত্যিই কিন্তু ভাবার সময় এসেছে।

দেখতে দেখতে চলে গেল ২০২৫-এর বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস। সুজলা সুফলা বসুন্ধরাকে বাঁচাতে অঙ্গীকার বদ্ধ হওয়ার দিন। বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস পরিবেশ রক্ষার জন্য সমর্থন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ২২শে এপ্রিলই পালিত হয়। পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে এই দিবস ধার্য করা হয় ১৯৭০ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশবাদী আন্দোলনের ফলস্বরূপ এই দিনটি পালন করা হয়।

ঘটনার সূত্রপাত ১৯৬৯ সালে সান্তা বারবারায় তেল উপচে পড়ার থেকে। তার সঙ্গে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল বাতাসে ধোঁয়াশা ও দূষিত নদীর মত বিষয়গুলি নিয়েও। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েই পথে নেমে এসেছিলেন পরিবেশ সচেতন সাধারণ মানুষ। এরপর গত ৫০ বছরে পরিবেশ বাঁচাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে এসেছে এই 'বসুন্ধরা দিবস'। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জর্জরিত। এমন প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং পৃথিবীকে নিরাপদ এবং বসবাসযোগ্য রাখতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই এই দিনটি পালন করা হয়। পরিবেশ রক্ষার কথা মাথায় রেখে ১৯৭০ সালের পর থেকে বিভিন্ন দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়। তবুও আজ পৃথিবী সঙ্কটের মুখে।

প্রতি বছরই ধরিত্রী দিবস উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট একটি থিম থাকে। এই বছর অর্থাৎ ২০২৫-এর বিষয় ভাবনা ছিল: "our power, our planet." বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত কারণে জলবায়ু পরিবর্তনে পরিবেশ দূষণ সীমা ছাড়িয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং পৃথিবীকে নিরাপদ এবং বসবাসযোগ্য রাখতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটি পালন করা হয়। গোটা পৃথিবী বিধ্বস্ত তখন যেন আরও বেশি করে পরিবেশকে রক্ষা করতে শেখায়। অনুপ্রেরণা যোগায় পৃথিবীকে আরও সুন্দর, আরও নিরাপদ করে তুলতে।

গাছ কেটে ফেলা, দূষণ এই সব একাধিক কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে আমাদের জীবনের প্রভাব পড়েছে। দেখা যাচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। জলবায়ুর পরিবর্তন গোটা বিশ্বকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে ফেলে দিচ্ছে। এতে ক্ষতি হচ্ছে আমাদেরই। পদক্ষেপ নিতেও+ হবে আমাদেরই। আসুন সকলে মিলে কাঁধে কাঁধ মিলে আমরা এগিয়ে আসি। আর আমাদের বসুধাকে রক্ষা করি...

"আমাদের ক্ষমতা, আমাদের বসুধা ;".

অনুষ্ঠান প্রযোজক,
রেডিও কলকাতা

মানুষ-প্রাণী সংঘাত

সৈকত কুমার বসু

মানুষ-প্রাণী সংঘাত বলতে এমন এক পরিস্থিতি বোঝায় যেখানে বন্যপ্রাণী মানুষের জীবন, জীবিকা বা সম্পত্তির জন্য সরাসরি হুমকি স্বরূপ হয়ে ওঠে, এবং যেখানে মানুষ পালাক্রমে সেই প্রাণীদের ক্ষতি করে, হত্যা করে, বা স্থানচ্যুত করে। এটি প্রায়শই ঘটে যখন বন্যপ্রাণী এবং মানুষ একই পরিবেশ ভাগ করে নেয় অথবা যখন মানুষের কার্যকলাপ প্রাকৃতিক আবাসস্থল দখল করে।

উদাহরণ: হাতি বা বুনো শুয়োরের মতো প্রাণীদের দ্বারা ফসলের ক্ষতি। বাঘ, সিংহ বা নেকড়েদের মতো শিকারি শ্বাপদদের দ্বারা গবাদি পশু হত্যা বা মানুষের উপর আক্রমণ, বিশেষ করে বন বা সংরক্ষণাগারের কাছাকাছি এলাকায়। মানুষের দ্বারা প্রতিশোধ, যেমন বিষক্রিয়া বা হুমকি স্বরূপ প্রাণী শিকার।

কারণ, বন উজাড়, কৃষি বা নগর উন্নয়নের কারণে আবাসস্থলের ক্ষতি। বন্যপ্রাণী অঞ্চলে মানব বসতি সম্প্রসারণ। বনাঞ্চলে খাদ্য বা জলের অভাব, বন্যপ্রাণীদের মানব এলাকায় প্রবেশ করতে বাধ্য করে।

প্রভাব: মানুষ এবং প্রাণীদের আঘাত বা মৃত্যু। অর্থনৈতিক ক্ষতি (যেমন, ফসল ধ্বংস বা গবাদি পশু হত্যা)। প্রতিশোধ বা স্থানচ্যুতির কারণে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস। সংরক্ষণের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব।

পরিবেশগত, উন্নয়নমূলক এবং সামাজিক কারণের সংমিশ্রণের ফলে ভারতে মানুষ-প্রাণী দ্বন্দ্ব বাড়ছে। এখানে একটি বিভাজন দেওয়া হল: ভারতে মানুষ-প্রাণী দ্বন্দ্ব বৃদ্ধির কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত কারণগুলি ধরা যেতে পারেঃ আবাসস্থলের ক্ষতি এবং খণ্ডিতকরণ: কৃষি, পরিকাঠামো এবং নগর সম্প্রসারণের জন্য দ্রুত বন উজাড় হওয়ার ফলে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হ্রাস এবং খণ্ডিতকরণ হচ্ছে, যার ফলে প্রাণীরা মানব বসতিতে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বন এলাকায় দখল: মানব বসতি, খামার এবং রাস্তাঘাট ক্রমশ ঐতিহ্যবাহী বন্যপ্রাণী করিডোর এবং বনাঞ্চল দখল করছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি: মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমি এবং সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে বনের উপর চাপ পড়ে এবং বন্যপ্রাণীর সাথে মুখোমুখি যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।

কৃষি সম্প্রসারণ: বনের কাছাকাছি খামারগুলি হাতি, বুনো শুয়োর এবং নীলগাইয়ের মতো প্রাণীদের আকর্ষণ করে, যারা ফসল লুট করে, যার ফলে সংঘাতের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক শিকারের অবক্ষয়: অতিরিক্ত শিকার এবং আবাসস্থলের অবক্ষয় শিকারের প্রাপ্যতা হ্রাস করে, যার ফলে বাঘ এবং চিতাবাঘের মতো শিকারিরা গবাদি পশু বা মানুষের উপর আক্রমণ করে।

জলবায়ু পরিবর্তন: বৃষ্টিপাতের ধরণ পরিবর্তন এবং জল প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতার কারণে প্রাণীরা খাদ্য ও জলের সন্ধানে মানব-অধ্যুষিত অঞ্চলে ছুটে যায়।

পরিকাঠামো উন্নয়ন: মহাসড়ক, রেলপথ এবং শিল্প প্রকল্পগুলি অভিবাসন পথ ব্যাহত করে এবং বাধা তৈরি করে, যার ফলে প্রাণঘাতী প্রাণী পারাপার এবং সংঘাত বৃদ্ধি পায়।

সংঘাত মোকাবিলায় সমাধান:

আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং সুরক্ষা: ক্ষয়প্রাপ্ত জমি পূণর্বনায়ন, গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল রক্ষা এবং নিরাপদ প্রাণী চলাচলের জন্য পরিবেশগত করিডোর বজায় রাখা।

সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা: সচেতনতামূলক কর্মসূচি, ক্ষতিপূরণ প্রকল্প এবং ইকো-ট্যুরিজম সুবিধার মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে স্থানীয় সম্প্রদায়কে জড়িত করা প্রয়োজন।

প্রযুক্তির ব্যবহার: প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা, জিপিএস ট্র্যাকিং এবং নজরদারি (যেমন ক্যামেরা ট্র্যাপ বা ড্রোন) স্থাপন করা যাতে প্রাণীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং সতর্কতা জারি করা যায়।

ক্ষতিপূরণ এবং বীমা: প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড কমাতে এবং সহাবস্থানকে উৎসাহিত করতে ফসল বা গবাদি পশুর ক্ষতির জন্য দ্রুত এবং ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।

পরিবেশ-সংবেদনশীল পরিকল্পনা: সংরক্ষিত এলাকার চারপাশে ওভারপাস, আন্ডারপাস এবং বাফার জোনের মতো প্রাণী-বান্ধব বৈশিষ্ট্য সহ পরিকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং তথ্য ব্যবহার: পরিকল্পনা এবং সংঘাত প্রশমন কৌশলগুলিকে অবহিত করার জন্য প্রাণীর আচরণ এবং অভিবাসন সম্পর্কিত গবেষণাকে সমর্থন করতে হবে।

উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কঠোর নিয়ন্ত্রণ: পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন কার্যকর করার প্রয়োজন এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের কাছাকাছি ক্ষতিকারক প্রকল্পগুলিকে সীমাবদ্ধ করতে হবে।

সদস্য, কার্যকরী সমিতি, ইসনা

রামব্রহ্ম সান্যাল: ভারতীয় চিড়িয়াখানার পথিকৃৎ

পাতা ৩ এর পর>>

তাদের জন্য বিদেশে যোগাযোগ করা, যাত্রাপথে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা সব দায়িত্বই রামব্রহ্মকে পালন করতে হত।

সাপের বিষ নিয়ে গবেষণার জন্য আলিপুরে একটি গবেষণাগার তৈরি করা হয়। এর জন্য জয়গোবিন্দ লাহা পনেরো হাজার টাকা দান করেন। সাপের বিষ নিয়ে এখানে গবেষণা চালান রামব্রহ্ম। তিনি বিজ্ঞানী ড. কানিংহামের অধীনে কাজ করে এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। আলিপুরের গবেষণাগারে এই গবেষণার ফলাফল তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

চিড়িয়াখানার আয় বৃদ্ধির জন্য নানা পরিকল্পনা করা হত। সে বছর, ১৮৮০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, বড়দিনে দর্শকদের টানতে চিড়িয়াখানার ভিতরে ইলেকট্রিক ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রামব্রহ্ম ট্রেন চালানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন বার্ন কোম্পানিকে। পশুশালায় এই ছোট ট্রেন দেখতে খুব ভিড় হয়। বাংলার ছোটলাট অ্যাশলে ইডেন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন সেদিন। চিড়িয়াখানায় টিকিট বিক্রি বেড়ে গিয়েছিল হু-হু করে।

কাজের ফাঁকে রামব্রহ্ম বই লিখতেন। দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও গবেষণা নিয়ে লেখা তাঁর বই 'আ হ্যান্ডবুক অব দ্য ম্যানেজমেন্ট অব দি অ্যানিম্যালস ইন ক্যাপটিভিটি ইন লোয়ার বেঙ্গল' প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। বিভিন্ন দেশের ২৪১ প্রজাতির বন্যপশু, ৪০২ প্রজাতির পাখি ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে লেখা এই গ্রন্থটি জীববিজ্ঞানীদের কাছে একটি মূল্যবান গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে রামব্রহ্ম সান্যালের নাম।

ইংল্যান্ডের 'নেচার' পত্রিকায় বইটির আলোচনা প্রকাশিত হয়। বিগত ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় বই 'আওয়ার্স উইথ নেচার'। এই বইয়ে তিনি আমাদের দেশের নদীনালা, বনজঙ্গল, পুকুর থেকে শুরু করে চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, বোটানিকাল গার্ডেন নিয়ে নানা আলোচনা করেছেন। ছোটদের জন্য গল্পের আকারে বিভিন্ন প্রাণী সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশন করেছেন, যাতে তারাও জীবজন্তুদের ভালবাসতে শেখে।

আন্তর্জাতিক প্রাণিবিজ্ঞানী সম্মেলনেও যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন রামব্রহ্ম সান্যাল। সম্মেলনের পর তিনি ইউরোপের বিভিন্ন শহরের চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করেন। লন্ডন, বার্লিন, হামবুর্গ, প্যারিস, ভিয়েনার পশুশালা দেখে এসে, আলিপুর পশুশালার উন্নতি সাধনে কী কী করতে হবে তা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। একই সঙ্গে বিদেশের পশুশালাগুলির দোষত্রুটিও উল্লেখ করেছেন, বন্দি অবস্থায় প্রাণীদের সুস্থ জীবনযাপনের বিষয়ে তাঁর প্রস্তাব পেশ করেছেন বিদেশে। ওই বছরেই ভারত সরকার রামব্রহ্মকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব দেয়। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল তাঁকে অ্যাসোসিয়েট মেম্বার নির্বাচিত করে। তিনি লন্ডন জুলজিকাল সোসাইটির সাম্মানিক পদও পেয়েছিলেন। তাঁর লেখা গবেষণাপত্রগুলিও জীববিজ্ঞানীদের কাছে মূল্যবান। অন্য রাজ্যে পশুশালার কোনও সমস্যায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁর পরামর্শ চাইতেন। উপদেষ্টা হিসেবে তাঁকে বম্বে (এখন মুম্বই) গিয়ে কিছু দিন থাকতে হয়েছিল। যেতে হয়েছিল তৎকালীন রেঙ্গুনেও।

একমাত্র পুত্র হেমন্ত কুমারের অকালমৃত্যু এবং কিছু দিন পরে স্ত্রীর মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পরেন তিনি। পশুশালার কাজ তবুও নিয়মমাফিক করতেন। দিনটি ছিল ১৯০৮ সালের ১৩ই অক্টোবর, যেদিন তিনি তাঁর অফিসেই অসুস্থ হয়ে পরেন এবং মাত্র ৫০ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এই বিজ্ঞানী, যিনি একজন প্রকৃতিবিদ এবং চিড়িয়াখানা বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রাণিবিদ্যা ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছিলেন, তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সহায়িকা, ইসনা

বিশ্ব পিতৃ দিবসঃ কচ্ছপেরাও পালন করল

অশোক সেনগুপ্ত

গত কয়েক বছরেই এই ঝোঁকটা বেশ বেড়েছে। সারা দুনিয়া জুড়ে। মাতৃ দিবস পালিত হলে পিতৃ দিবস পালিত হবে না কেন?

আবার একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে পশু পাখিরা কি দোষ করল? তাদের জন্যই বা এই দিনগুলো উদযাপন করা হবে না কেন?

গত ১৬ই জুন বিভিন্ন খবরের কাগজ খুলে দেখা গেল পশুপ্রেমীদের এই দাবিকে বিশেষ মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এবার বিশ্ব পিতৃ দিবস পড়েছিল তার আগের দিন, অর্থাৎ ১৫ই জুন। বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় পালিত হয়েছিল এই দিনটি তাদের প্রবীণতম আবাসিকদের জন্য। কারা এই গোত্রভুক্ত বলুন তো? ঠিক ধরেছেন - কচ্ছপ!

আমেরিকায় দক্ষিণ ফ্লোরিডায় মায়ামি চিড়িয়াখানায় এই দিনে নায়ক হিসেবে উঠে এসেছিল গোলিয়াথ। গ্যালাপাগোস প্রজাতির এই কচ্ছপটির ওজন কম করে ২৩৪ কিলো। একই দিনে তার ১৩৫তম জন্মদিনও পালন করা হয়। জন্মদিন পালনের কারণটিও উল্লেখযোগ্য। এই প্রথম গোলিয়াথ সন্তানের বাবা হয়েছে। মায়ের নাম "সুইট পি।" তারও বয়স এক শতাব্দীর কাছাকাছি।

গত ৪ঠা জুন আটটা ডিমের মধ্যে একটি ফুটে তাদের সন্তানের জন্ম হয়েছে। সন্তানসহ বাবা/মা ভালোই আছে এবং দর্শকদের মনোরঞ্জন করছে বলে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানায় অদ্বৈতর কথা মনে আছে? অ্যালডাব্রা প্রজাতির বিশ্বের প্রবীণতম ঐ দৈত্যাকার কচ্ছপ নানা সময়ে খবরের শিরোনামে এসেছে। জোনাথন নামে আর একটি কচ্ছপেরও খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল, যার আনুমানিক বয়স ছিল প্রায় ১৯১। অদ্বৈত তাকেও ছাড়িয়ে যায়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ২৫০ বছরেরও বেশি।

দীর্ঘ জীবনকালের জন্য কচ্ছপ বিশেষ পরিচিত। এর বিভিন্ন প্রজাতি ৮০ থেকে ১৫০ বছরের মধ্যে বাঁচে।

অদ্বৈতর কথায় মনে পড়ল দিয়েগোর (উচ্চারণভেদে ডিয়েগো) কথা। কে ছিল দিয়েগো? বিশ্ব পিতৃ দিবসে অন্যরকম বাবা হিসাবে ওর কথা লেখা হয়েছে। এক কথায় দিয়েগোকে বলা যেতে পারে দুনিয়া জোড়া এক কচ্ছপ প্রজাতির অন্যতম জনক।

কি লেখা হয়েছে ওকে নিয়ে? সন্তান জন্ম দেওয়াই তার নেশা। টানা ৪৩ বছর সন্তান প্রজননের পর অবশেষে অবসর নেয় দিয়েগো। ততদিনে সন্তানের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৮০০। কার্যত একা নিজের প্রজাতিকে উদ্ধার করে আক্ষরিক অর্থেই সে 'জাতির পিতা'। নেপথ্যে নেই কোনও স্পার্ম ডোনেশন। একেবারে প্রাকৃতিক ভাবেই নিজের বংশবৃদ্ধি করা সেই দিয়েগো যে এক দৈত্যাকার কচ্ছপ সে ব্যপারে কোন সন্দেহ নেই।

ষাটের দশকে অত্যাধিক শিকার এবং বাসস্থান ধ্বংসের কারণে এস্পানিওলা দ্বীপের এই দৈত্যাকার কচ্ছপ প্রজাতি প্রায় বিলুপ্ত হতে বসে। এক সময় এই প্রজাতির কচ্ছপের সংখ্যা কমে মাত্র ১৫টিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। যার মধ্যে ১২টি ছিল স্ত্রী এবং ৩টি পুরুষ। প্রজাতিটিকে চরমভাবে বিপন্ন বা বিলুপ্তপ্রায় হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।

এই অবস্থায় কচ্ছপের এই প্রজাতিটিকে বাঁচানোর জন্য, গ্যালাপাগোস ন্যাশনাল পার্ক এবং চার্লস ডারউইন ফাউন্ডেশন একটি কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি চালু করে। সেই সময় প্রজননে সক্ষম পুরুষ কচ্ছপ হিসাবে বেছে নেওয়া হয় দিয়েগোকে। দিয়েগো তখন সান দিয়েগো চিড়িয়াখানায় থাকত। তাকে সান্তা ক্রুজ দ্বীপে একটি কচ্ছপ প্রজনন কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় ১৯৭৭ সালে। এরপরই ক্রমাগত সন্তানের জন্ম দিয়ে গিয়েছে সে।

ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে প্রজনন কর্মসূচিতে জন্ম নেওয়া সমস্ত কচ্ছপের মধ্যে প্রায় ৪০% কচ্ছপের পিতাই দিয়েগো। অর্থাৎ দিয়েগোর সন্তান সংখ্যা প্রায় ৮০০

থেকে ৯০০। এই কর্মসূচি সফল হওয়ায় এখন প্রজাতিটি আর বিলুপ্ত নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে কৃত্রিম প্রজননের আর প্রয়োজন নেই। দিয়েগোকে এই কর্মসূচি থেকে অবসর দেওয়া হয় ২০২০ সালের জুন মাসে। অবসরের পর দিয়েগোকে বন্য পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সে দিনটিও পিতৃ দিবস ছিল কি না তা অবশ্য জানা যায়নি। একটি ছোট্ট সংযোজন করি৩ দিয়েগো কথাটি স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত। যদিও এসেছে গ্রীক শব্দ 'ডিডাকাস' থেকে। এটি সেন্ট জেমসের স্প্যানিশ নাম। কথাটির অর্থ Ôhe who supplants.'

বিশিষ্ট প্রাক্তন সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস
ইসনার উদ্যোগে বিশেষ অনুষ্ঠান

মালবিকা সেনগুপ্ত

ইন্ডিয়ান সাইন্স নিউজ এসোসিয়েশন (ইসনা)র উদ্যোগে গত ৯ই জুন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে (রাসবিহারী প্রাঙ্গন) এন . আর. সেন প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হল। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম ছিল, "Beat Plastic Pollution."

অনুষ্ঠানে মূল বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী, ডঃ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী, ও নিউ জিল্যান্ড থেকে আগত প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞানী প্রেমজিৎ তরফদার। চেয়ারম্যান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও পরিবেশ বিষয়ক লেখক ডঃ দেবদূত ঘোষঠাকুর।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তাদের গাছের চারা উপহার দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। ইসনার অনারারি সেক্রেটারি অধ্যাপক মানস চক্রবর্তী তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ইসনার গঠনের ইতিহাস ও বিভিন্ন কার্যাবলী বর্ণনা করেন। তিনি জানান যে প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা ছিল। উদাহরণ স্বরূপ তিনি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে ১৯৭৮ সালেও পরিবেশ দিবসের একই থিম ছিল। সে বছর ভারত আয়োজক দেশ হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছিল।

এরপর ইসনার সহ-সভাপতি প্রশান্ত কুমার বসু বক্তাদের সাথে শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিচয় করিয়ে দেন।

ডক্টর স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। বিভিন্ন ধরণের প্লাস্টিক নিয়ে তিনি বিশদে বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা যে প্লাস্টিক ব্যবহার করছি তার থেকে কি ক্ষতি হতে পারে তা জেনে বুঝেই ব্যবহার করছি। কিন্তু তা বর্জন করতে পারছি না। বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু কি ভাবে তা দূর করা যায় তা নিয়ে সভ্যসমাজ দিশেহারা।

এ প্রসঙ্গে তিনি সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের কথা তুলে ধরেন। পরিশেষে বায়ো প্লাস্টিক নিয়ে আলোচনায় তিনি জানান যে ভুট্টা থেকে প্লাস্টিক উৎপন্ন হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরো বেশি মাত্রায় এই বায়োপ্লাস্টিক ব্যবহার করতে তিনি সকলকে উৎসাহ দেন।

পরবর্তী বক্তা ছিলেন শ্রী প্রেমজিৎ তরফদার। তিনি নিউজিল্যান্ডে অবস্থিত এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ঊষবপঝুংখধন নামক গবেষণাগার নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।

তিনিবলেন,কৃষিকার্যে নিত্যনৈমিত্তিক প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়। সেই সব মাইক্রোপ্লাস্টিক খাবার ও জলের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের কৃষিকার্য প্লাস্টিকের উপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল। প্লাস্টিক আমাদের জীবন সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করে নিয়েছে।

তিনি জানান, গঁষপয ফিল্ম, পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য পলি-নেট, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত জল সঞ্চয়ের জন্য পুকুরে পলি-লাইনার, বা পোলহাউসে উৎপাদিত সামগ্রী সংগ্রহ ও পরিবহন পলি-প্যাকেজিং এর উপরে নির্ভরশীল। ফলে প্লাস্টিক প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ হিসেবে বেরোচ্ছে। এক্ষেত্রে তিনি হোয়াইটশেড (Whiteshed)-এর সাথে তুলনা করে বলেন যে যেহেতু প্লাস্টিক ব্যবহৃত হচ্ছে না, সেজন্য এখানে কোন বর্জ্য পদার্থ নেই।

"হাইড্রোপনিক" পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন এই পদ্ধতিতে অল্প প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে বেশি পরিমাণে শস্য উৎপাদন করা সম্ভব। মাটির একদমই ব্যবহার চলবে না। শুধুমাত্র অতি প্রয়োজনীয় উপাদানে ভরপুর জলের মধ্যে চাষ হবে। তিনি বলেন যে "হাইড্রোপনিক"পদ্ধতিতে অল্প জল দিয়ে একই পরিমাপের জমিতে কম সময়ে অধিক পরিমাণ ফসল ফলানো সম্ভব। একই পরিমাণ জমিতে মৃত্তিকার ব্যবহারে অনেক বেশি সময় লাগবে, জল বেশি খরচ হবে ও কম পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে।

পরবর্তী বক্তা ডঃ দেবদূত ঘোষঠাকুর বিজ্ঞান সাংবাদিকতা নিয়ে মূল্যবান মতামত দেন। তিনি বলেন বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা যেন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। খুব সহজ, সরল ভাষাতে জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি ব্যখ্যা করতে হবে যাতে গ্রামের প্রান্তিক মানুষজনও এই তথ্য বুঝতে পারেন।

তাঁর স্মৃতিচারণে এক বিশিষ্ট আবহাওয়া বিশারদের পদ্ধতি অবলম্বন করে কিভাবে তিনি আবহাওয়া দফতরের খবর লিখতে শিখেছিলেন সে সম্পর্কে জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে সৌরশক্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম কাজ শুরু হয়েছিলো। সুন্দরবন অঞ্চলে সাগরদ্বীপে এই কাজ শুরু হয়।

ডঃ ঘোষঠাকুরের হাতেই ইসনার বাংলা ই - ম্যাগাজিন "বিজ্ঞান কহন"-এর উদ্বোধন হয়। এই সংখ্যায় কি কি বিষয়ে লেখা থাকছে সে সম্পর্কে জানান যুগ্ম সম্পাদক ডঃ অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর ইসনার সভাপতি অধ্যাপক বিকাশ চক্রবর্তী "ফ্লোটিং অন আর্থ" বিষয়ে নাতিদীর্ঘ এবং একটি প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা দেন। সুপারকন্টিনেন্ট গন্ডোয়ানা থেকে আরম্ভ করে সহজ ভাষায় তিনি ভারতের উত্থান ও হিমালয়ের আবির্ভাব বর্ণনা করেন।

তিনি জানান যে কলকাতা শহরে বর্তমানে প্রচুর বহুতল ভবন নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু এই নির্মাণ এ শহরের পক্ষে অবশ্যই ক্ষতিকারক। কলকাতা বর্তমানে সিসমিক জোন ওঠ এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু পাশের জোন ঠ এবং বহুতল বাড়ি নির্মাণ শহরকে ভূমিকম্পের মত বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে ইসনার অনারারি সেক্রেটারি ডক্টর অমিত কৃষ্ণ দে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন ইসনার প্রাক্তন ছাত্রী ডঃ এষা পণ্ডিত।

বিজ্ঞান শিক্ষিকা ও প্রাক্তন ছাত্রী, ইসনা

রাজ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

পাতা ৫ এর পর>>

জেলাস্তর থেকে সফল ২০% ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

গোটা রাজ্য থেকে নবম শ্রেণীর সেরা ১০০ জন পড়ুয়াদের মেধা বৃত্তি প্রদান করা হবে। জেলা ও রাজ্য স্তরের পরীক্ষা (দ্বিতীয় ও শেষ) গোটা রাজ্যে দুই পর্যায়ে একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। তারিখ প্রতিষ্ঠানের তরফে পরে ঘোষণা করা হবে। নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের সারাবছর প্রতিষ্ঠানের তরফে বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে - কর্মশালা, আলোচনাসভা (workshop / seminar) ইত্যাদির মাধ্যমে। একদিকে যেমন পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি অনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের নানাবিধ বিষয়ের উপর আগ্রহ তৈরী করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, অন্যদিকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরের সায়েন্স অলিম্পিয়াডগুলিতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ করার প্রশিক্ষণও প্রদান করা হবে।

প্রথম স্তরের পরীক্ষার এডমিট কার্ড প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের (www.jbnsts.ac.in) মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সংগ্রহ করতে পারবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী নির্দেশাবলী প্রতিষ্ঠানের তরফে ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে।

প্রাক্তন ছাত্র, ইসনা

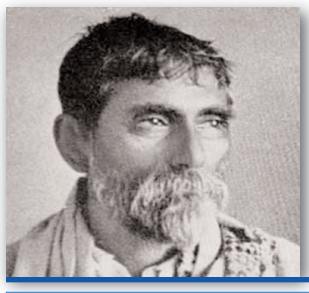

বিজ্ঞান কথন

কলকাতা/ জুন ৯, ২০২৫ সোমবার, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাঃ এক যুগান্তকারী বিপ্লব

ঋতবান মুখোপাধ্যায়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কেবল এখন আর ভবিষ্যতের কোনো ধারণা নয়। এটি আমাদের জীবনকে অগণিত উপায়ে রূপান্তরিত করছে এমনই এক দৈনন্দিন বাস্তবতা। আপনার স্মার্টফোনে দ্রুততম রুট খুঁজে পেতে, স্প্যাম টেক্সট ব্লক করতে বা আপনাকে জল পান করতে মনে করাতে এআই নীরবভাবে কাজ করে চলে। একজন চতুর বন্ধুর মত যে সময়ের সাথে সাথে আপনার অভ্যাসগুলো শিখে ফেলে।

এই সব সুবিধার মূলে রয়েছে নিউরাল নেটওয়ার্ক, একটি জটিল সিস্টেম যা বিপুল পরিমাণ ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করে মুখ চেনা, প্রতারণা সনাক্ত করা এবং এমনকি আপনার পরবর্তী টিভি শো সুপারিশ করতেও সাহায্য করে।

এআই-এর মূল উদ্দেশ্যই হল নিরবচ্ছিন্ন শিখতে থাকা। এটি প্রতিদিন অ্যাপ্লিকেশনগুলির বিশাল ডেটা সংগ্রহ থেকে শিক্ষা নিয়ে থাকে, ঠিক যেমন এটী আপনার মিউজিক অ্যাপ থেকে আপনার প্রিয় সুর শেখে।

এআই দুটি প্রধান শেখার পদ্ধতি ব্যবহার করে। সুপারভাইজড লার্নিং-এ, সিস্টেমগুলোকে মানুষ দিয়ে লেবেলের সাহায্যে উদাহরণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়, যেমন ধরুন "বিড়াল" বা "কুকুর" হিসেবে চিহ্নিত ছবি।

অপরদিকে, আন-সুপারভাইজড লার্নিং এআইকে নিজে থেকেই প্যাটার্ন আবিষ্কার করতে দেয়, পূর্বসূরী কোনো ইঙ্গিত ছাড়াই সাদৃশ্যপূর্ণ ছবি বা শব্দগুলিকে গুচ্ছবদ্ধ ব্যবহার করে। প্রতিবার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এআই তার পূর্বাভাসগুলো আরও শুদ্ধ করে তোল্লেযেমন অটোকরেক্ট আপনার

দেখাচ্ছে না বা অদ্ভুত কোনো কুপনের সুপারিশ এসেছে, এ সব ক্ষেত্রে৩গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া প্রদান করে

বিশেষ টাইপিং স্টাইল বুঝতে পারে বা ম্যাপ অ্যাপ ট্রাফিকের পূর্বাভাস নির্ভুল করে।

আকর্ষণীয়ভাবে, এআই তার ভুলের মধ্য দিয়েই স্মার্টে পরিণত হয়। প্রতিটি ভুলযেমন বন্ধুর মুখ সঠিকভাবে থাকে। বিশেষজ্ঞরা যাকে

"এরর ফাংশন" বলেন, এআই সেই অনুযায়ী তার অভ্যন্তরীণ সেটিংসে সামঞ্জস্য নিয়ে আসে। সময়ের সাথে সাথে, এই সামঞ্জস্যগুলো সিস্টেমকে নির্ভুল করতে সহায়তা করে।

অবশ্য কখনও কখনও এগুলি লুকানো পক্ষপাতিত্বও প্রকাশ করে, বিশেষ করে যদি প্রশিক্ষণ ডেটা যথেষ্ট বৈচিত্র্যময় না হয়। যেমন রান্নাঘরের কোনো ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে একটি রেসিপি নিখুঁত করা হয় ।

এআই-এর অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালীকে অনেকগুলো তলবিশিষ্ট একটি উঁচু বাড়ির সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

নীচের তলাগুলিতে মৌলিক আকৃতি বা সাধারণ শব্দ চেনার কাজ হয়, যখন ওপরের তলাগুলি আরও জটিল বিবরণ যেমন শব্দ, অনুভূতি বা পুরো মুখ গঠন করে। এই স্তরযুক্ত কাঠামো, যা ডিপ লার্নিং নামে পরিচিত, আপনার ফোনের ভয়েসঅ্যাসিস্ট্যান্টকে কথিত শব্দগুলোকে পাঠ্যে রূপান্তর করতে বা মুখ চেনার বৈশিষ্ট্যকে সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। এআই সাধারণ পিক্সেলগুলো লক্ষ্য করা থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম তথ্য ব্যাখ্যা করতে পারে, যার ফলে মিথস্ক্রিয়াগুলি প্রায় মানবসদৃশ মনে হয়।

এআই-এর প্রভাব ব্যক্তিগত ডিভাইসের সীমার বাইরে অনেক দূর অবধি বিস্তৃত।

স্বাস্থ্যসেবায়, হাসপাতাল গুলো এক্স-রে থেকে রোগের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করতে এআই ব্যবহার করে, আবার ব্যাংকগুলো মাত্র কয়েক সেকেন্ডে প্রতারণামূলক লেনদেন সনাক্ত করতে এআই-র উপর নির্ভর করে।

কৃষিক্ষেত্রও এআই থেকে উপকৃত হচ্ছে। যেমন ড্রোনগুলো ফসলের চাহিদা নির্ধারণ করে জল ও সার ব্যবহারে সহায়তা করে।

অবশ্য এই অসাধারণ সুবিধার পাশাপাশি, এআই-এর ব্যাপক ব্যবহার নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে। অ্যালগরিদমগুলি অনিচ্ছাকৃতভাবে পক্ষপাতিত্ব বজায় রাখতে অস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা ঋণের অনুমোদন বা চিকিৎসা নির্ণয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভবিষ্যতের দিকে তাকালে, এআই-এর ব্যবহার অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাপূর্ণ মনে হচ্ছে। ভবিষ্যতে এমনি অ্যাপ্লিকেশনগুলি পরিবেশ সুরক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বা ব্যক্তিগত কৃতশিক্ষা সহ বৃহৎ আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক হতে পারে। তবে, এআইকে যেমন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বা শক্তি ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমে ঢোকান হচ্ছে, তেমনই একটি সামান্য ভুলও ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

অতএব উন্নয়নকারী, নীতি নির্ধারক ও জনগণের মধ্যে সতর্ক তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা অপরিহার্য। দায়িত্বশীল নকশা ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়াগুলোই নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে যে এআই আমাদের জীবনকে সহজ ও কার্যকর করে তুলবে। একই সঙ্গে তা আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার সহায়ক হয়ে উঠবে।

ডিজিটালাইজেশন বিশেষজ্ঞ, পাওয়ার সেক্টরে সেরা ডিজিটাল উদ্যোগের জন্য ২০২৪ জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী
Email:ritaban.mukher-jee@icloud.com

প্রসঙ্গঃ আধুনিক বিজ্ঞান

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের যে বইটির কথা আমরা আলোচনা করব তা ছোট, বড় সবারই উপযোগী। বইটির নাম আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গে। লিখেছেন উৎপল মিত্র, আর প্রকাশ করেছেন সমীক্ষা প্রকাশনী।

বইটিতে লেখক উৎপল মিত্র অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ধৈর্য সহকারে বৈজ্ঞানিক নিউটন থেকে আরম্ভ করে আইনস্টাইন-হাইজেনবার্গ-শ্রডিংগার ও পারমাণবিক তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে কোয়ান্টাম তত্ত্ব, কণাতত্ত্ব , অনিশ্চয়তা তত্ত্ব থেকে প্রগতি বিষয়ে সুন্দর ভাবে ও সংক্ষিপ্তাকারে আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। আরও তিনি উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, স্টিফেন হকিং এর মতো মহান দার্শনিক বিজ্ঞানীদের বহু মূল্য

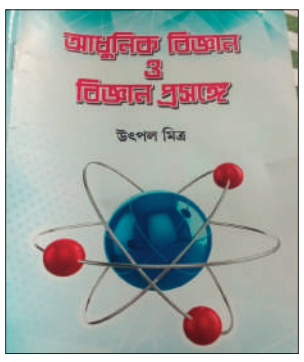

মতামত ও বৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তা। এই বইটি পড়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য যেমন জানা যাবে তেমনি বিজ্ঞানমনস্কতার সঞ্চার ঘটবে। এতে যেমন জনধারণের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা তৈরি হবে, তেমনই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ হবে।

বইটিতে আধুনিক বিজ্ঞান আলোচনা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বইটির কোন সূচিপত্র নেই ফলে পাঠককে পরপর পড়ে যেতে হবে। তাছাড়া, আলাদা করে বিষয়গুলো খুঁজে দেখার সুযোগ কম। এটিই বইটির সীমাবদ্ধতা। দুই একটি বানান ভুল থাকলেও ছাপার হরফ এবং পৃষ্ঠার মান বেশ ভালো। প্রচ্ছদ মানানসই , এবং বইটির মূল্য যথোপযুক্ত। লেখক সাবলীল ভাষায় বিজ্ঞানের যে ব্যাখ্যাগুলো দিয়েছেন তা পাঠকের পড়ে ভালো লাগবে। সংগ্রহে রাখার মত একটি বই।

আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ।।

লেখক উৎপল মিত্র ।।
প্রকাশক ড. শুভব্রত রায় চৌধুরী, সমীক্ষা প্রকাশনী, ১০৪, ডায়মন্ড হারবার রোড, বড়িষা, কলকাতা- ৭০০০০৮ ।।
প্রথম প্রকাশ ১৪২৫ ।।
মূল্য ৮০ টাকা ।।

নিবন্ধ পাঠানোর ই-মেল

bigyankahon@gmail.com

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদক: প্রশান্ত কুমার বসু
যুগ্ম সম্পাদক: অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক: সুকল্যাণ গাইন

সদস্য:
ড. বিকাশ চক্রবর্তী, ড. সুধেন্দু মণ্ডল, ড. মানস চক্রবর্তী, ড. বরুণ চ্যাটার্জি, ড. শ্যামল চক্রবর্তী, ড. অমিত কৃষ্ণ দে, ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, ড. মানসপ্রতিম দাস, ড. শঙ্করাশিস মুখোপাধ্যায়, ড. সুমিত্রা চৌধুরী, ড. সীমা মুখোপাধ্যায়, শ্রী দেবপ্রসন্ন সিংহ, ড. মীনাক্ষী দে, ড. বুড়োশিব দাশগুপ্ত, ড. কালিপ্রসন্ন ধাড়া ও ড. আশিস দাস

সম্পাদনা-সহকারী
মালবিকা সেনগুপ্ত, অর্পিতা চক্রবর্তী, তুহিন সাজ্জাদ শেখ, এষা পণ্ডিত, শেখ জিন্নাত আলি, অনির্বাণ দে, সৈকত কুমার বসু, রিজওয়ানা পারভীন, শেফালিকা ঘোষ সমাদ্দার, কৃষ্ণেন্দু রথ

কারিগরি উপদেষ্টা: শিব শঙ্কর দত্ত ও তনুশ্রী দে

৩৭ তম ট্রেনিং পোগ্রাম অন সায়েন্স কমিনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস,
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন,
৯২, এ পি সি রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ -এর পক্ষে
ড. অমিত কৃষ্ণ দে ও ড. টি ভি ভেঙ্কটশরণ কর্তৃক প্রকাশিত
ই-মেলঃ isnatraining@gmail.com
website: www.scienceandculture-isna.org

© ISNA: Articles may be reproduced with due acknowledgement to ISNA